দাঁড়কাকের সংসার কিংবা মাঝে মাঝে তব দেখা পাই

হুমায়ূন আহমেদ

BENGALIEBOOK.COM
★2022★

সূচিপত্র

১. আমার নাম লিপি........2

২. আজ শুক্রবার........27

৩. সোমবার আমার জন্যে অশুভ........53

৪. আমি স্বেচ্ছা কারাবন্দি........71

৫. রক্ত-চিকিৎসার প্রস্তুতি সম্পন্ন........93

৬. প্রতিমাকে নিয়ে সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে........125

৭. বড় মামা হোটেলে চলে যাবেন........128

১. আমার নাম লিপি

আমার নাম লিপি। আমি ক্লাস টেনে পড়ি। সায়েন্স গ্রুপ। স্কুলের নাম লালমাটিয়া গার্লস হাই স্কুল। আমি ঠিক করেছি গরমের ছুটিতে একটা উপন্যাস লিখব। উপন্যাসের নাম মাঝে মাঝে তব দেখা পাই। নামটা সুন্দর না? তবে এই নাম আমার দেওয়া না। নাম দিয়েছেন আহসান সাহেব। আহসান সাহেব আমাদের বাড়িওয়ালা। তিনতলায় থাকেন। তাঁর অনেক বুদ্ধি। উপন্যাস লেখার আইডিয়াও তিনি দিয়েছেন। আমার ধারণা তিনি সিরিয়াসলি এই আইডিয়া দেন নি। ফাজলামি করে দিয়েছেন। তিনি অনেক ফাজলামি করেন। মুখ গম্ভীর করে ফাজলামি করেন বলে বোঝা যায় না। তিনি অনেক রসিকতাও করেন। সর্দারজিদের নিয়ে তার একটা গল্প আছে। যতবার এই গল্পের কথা আমার মনে হয় ততবারই আমি একা একা হাসি। তাঁর সম্পর্কে আমি পরে লিখব। এখন উপন্যাসটা সম্পর্কে বলি।

আচ্ছা সর্দারজির জোকটা বলে নেই, পরে ভুলে যাব। যে-কোনো মানুষকে একটা পাতা ফটোকপি করতে দিলে পাঁচ মিনিটে ফটোকপি করে নিয়ে আসে, শুধু সর্দারজিরা এক ঘণ্টা সময় নেন। কারণ তারা মূল পাতার সঙ্গে ফটোকপি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মিলিয়ে দেখেন– সব বানান ঠিক আছে কি না।

আহসান সাহেব বলেছেন, উপন্যাসের শুরুর কয়েকটা লাইনে কোনো-না কোনো চমক থাকতে হবে। যেন পাঠক প্রথম কয়েকটা লাইন পড়েই হুকড হয়ে যায়। অর্থাৎ বরশিতে আটকে যায়। মনে মনে বলে, ঘটনাটা কী? উপন্যাসের ওপেনিং আর দাবার ওপেনিং এক

না। দাবার ওপেনিং নির্দিষ্ট হয় PK4 কিংবা PQ3। উপন্যাসের ওপেনিং নির্দিষ্ট না। তুমি যে-কোনো জায়গা থেকে শুরু করতে পারো। তবে শুরুতেই থাকবে চমক।

আমি বললাম, চমক একটা সস্তা বিষয় না?

উনি বললেন, সেটা নির্ভর করে চমকটা কে দিচ্ছে তার ওপর। দস্তয়েভস্কির চমক আর চাঁদপুরের ঔপন্যাসিক মোঃ শাহজাহান মিয়া বাবলুর চমক এক হবে না।

আমি বললাম, মোঃ শাহজাহান মিয়া বাবলুটা কে?

সে কেউ না, সে exist করে না। পৃথিবীর নিকৃষ্টতম ঔপন্যাসিকের উদাহরণ হিসেবে তাকে এনেছি। বুঝেছ My friend?

আমি বললাম, Yes friend.

আহসান সাহেবের মেজাজ যেদিন খুব ফুরফুরে থাকে সেদিন আমাকে My friend ডাকেন।

সমস্যা হচ্ছে বেশির ভাগ সময় তার মেজাজ থাকে খারাপ। আমার সঙ্গে মাঝে মাঝে কুৎসিত ব্যবহার করেন। একবার আমাকে বললেন, তোমার মধ্যে বাঁদর ভাব আছে, এই তথ্য কি জানো?

আমি বললাম, না।

তিনি বললেন, বাঁদর প্রজাতির আছে অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে অসীম কৌতূহল। এবং অস্থির স্বভাব। তোমারও তাই।

আচ্ছা এই প্রসঙ্গ এখন থাক। আমি আমার উপন্যাসের শুরুটা দুইভাবে ভেবে রেখেছি। কোনটা রাখব এখনো ঠিক করি নি। দুটোতেই চমক আছে। যেমন–

(ক) আমার পাশের ঘরে কে যেন গোঁ গোঁ শব্দ করছে। হঠাৎ শুনলে মনে হবে কাউকে ছুরি দিয়ে গলা কাটা হচ্ছে।

(খ) ঠিক দুপুরে একটা দাঁড়কাক এসে বসল আমাদের রেলিংয়ে। বসেই সে মানুষের গলায় ডাকল, কে আছ? কে?

দুটা শুরুতেই চমক আছে, তবে শেষেরটায় চমক একটু বেশি। প্রথমটায় ডিটেকটিভ উপন্যাস ভাব আছে। আমি ডিটেকটিভ উপন্যাস লিখব না, প্রেমের উপন্যাস লিখব। মনে হয় আমি কাকের মানুষের মতো কথা বলাটা রাখব। কাক তো আর মানুষের মতো কথা বলতে পারে না। কাজেই তার একটা ব্যাখ্যা থাকতে হবে। এমন হতে পারে যে, কাক কা কা করছে, সবাই ভুল শুনছে।

আহসান সাহেব বলেছেন, তোমাকে চরিত্র বর্ণনা করতে হবে। পুরোটা না হলেও কিছুটা। মনে করো, তুমি তোমার বাবার সম্পর্কে লিখছ। তোমার বাবা দেখতে কেমন এটা লিখতে হবে। যেন পাঠক তোমার বাবা সম্পর্কে খানিকটা ধারণা পায়। তারা উনার একটা ছবি কল্পনা করতে পারে। তোমার বাবা কত ফুট কত ইঞ্চি লম্বা এটা বলার দরকার নেই। তবে তিনি লম্বা না খাটো–এটা বলতে হবে। তার ওজন কত পাউন্ড কত আউন্স বলতে

হবে না। তিনি রোগা না মোটা এটা বলা দরকার। তিনি কী ধরনের কাপড় পরেন তা লিখতে পারো। সাধারণত যে সব বর্ণনা লেখকরা এড়িয়ে যান তা দিতে পারো। যেমন, কী জুতা পরেন এবং জুতার ফিতা কীভাবে বাঁধেন।

আমি বললাম, জুতার ফিতা বাঁধাও লিখতে হবে?

তিনি বললেন, লিখতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। তবে তুমি যদি লেখো তাহলে পাঠক ভাববে, এই লেখকের Power of observation তো ভালো। তারা আগ্রহ নিয়ে তোমার লেখা পড়বে। বুঝেছ?

আমি বললাম, Yes sir. : তিনি, সঙ্গে সঙ্গে বললেন, এখন তোমার Power of observation-এর . পরীক্ষা। বলো দেখি, আমি যখন বাইরে যাই তখন কোন ধরনের জুতা পরি?

আমি বললাম, আপনি বাইরে যাওয়ার সময় কখনো জুতা পরেন না। স্যান্ডেল সু পরেন। আপনার ছয় থেকে সাত জোড়া জুতা আছে। আমি আপনাকে কখনো জুতা পরতে দেখি নি।

তিনি বললেন, ভেরি গুড!

আহসান সাহেবের কথা মেনে লিখতে হলে দাঁড়কাকটার বিষয়ে আরও কিছু লেখা দরকার। আমি লিখতে পারছি না। কারণ দাঁড়কাক আমি কখনো ভালোমতো দেখি নি। ক্লাস এইটে পড়ার সময় একটা দাঁড়কাক সত্যি সত্যি। আমাদের বাসার রেলিংয়ে বসে কা কা করে

ডাকত। মা আমাদের বলে দিয়েছিলেন, কাক ডাকতেই আমরা যেন তাড়াবার ব্যবস্থা করি। কাকের ডাক খুবই অলক্ষণ। মার কথা সত্যি হতেও পারে। কাক ডাকাডাকির কিছুদিনের মধ্যেই আমার দাদি মারা গেলেন। কাক ডাকাও বন্ধ। অনেক দিন কাক ডাকছে না। মনে হয় খুব শিগগিরই আমাদের বাসায় কেউ মারা যাচ্ছে না। : আমার দাদির নাম মর্জিনা বিবি। যৌবনকালে তিনি কেমন ছিলেন, আমি জানি না। তখন তো তাঁকে দেখি নি। মৃত্যুর সময় তার চেহারা ডাইনি বুড়ির মতো হয়ে গিয়েছিল। গর্ত গর্ত চোখ। চামড়া শুকিয়ে প্লাস্টিকের মতো হয়ে বিকট। দেখাত। মাথায় চুল ছিল না। শুধু ডানদিকের কানের কাছে এক গোছা পাটের মতো চুল। চুলের এই গোছা তিনি খুবই যত্ন করতেন। নিজের হাতে তেল দিতেন। কাঠের চিরুনি দিয়ে আঁচড়াতেন। একদিন দেখি বেণিও করেছেন।

আমি বললাম, দাদিমা চুলে বেণি করেছ? দাদিমা বললেন, বেণি করলে তোর কী? তুই ... দিয়া বেণি কর।

আমি ডট ডট দিয়ে যে শব্দটা লিখেছি সেই শব্দটার মানে খুব খারাপ। হিন্দিতে চুল বললে যা বোঝায় তা। দাদিমা সারাক্ষণ কোনো-না-কোনো খারাপ কথা বলতেন। একবার আমাকে পাশে বসিয়ে বললেন...। না থাক, এটা বলা। যাবে না। আহসান সাহেব যদিও বলেছেন উপন্যাসে মিথ্যা থাকবে না। মিথ্যায় খারাপ কোনো প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় না। তারপরেও আমার মনে হয়, সব সত্যি লেখা উচিত না। উনাকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিতে হবে, নোংরা কথা থাকবে কি না। আমরা তো প্রায়ই নোংরা কথা বলি।

আমাদের ক্লাসে একটা মেয়ে আছে, নাম প্রতিমা। প্রতিমার মতোই সুন্দর। কী সরল চেহারা! কী স্নিগ্ধ ছলছলা চোখ! দেখতে মনে হয় ভাজা মাছ উল্টে খাওয়া দূরে থাকুক,

সে ভাজা মাছই খেতে পারে না। অথচ এই মেয়ে কী যে অসভ্য! তার মুখে সারাক্ষণ নোংরা কথা। একদিন আমাকে বলে কী–লিপি! বিয়ে করার সময় খেয়াল রাখবি ছেলে যেন বেঁটে হয়।

আমি বললাম, কেন?

প্রতিমা গলা নামিয়ে বলল, বেঁটে ছেলেদের ওই জিনিস হয় লম্বা। তাদের সঙ্গে Sex করে খুব আরাম।

তুই করেছিস?

প্রতিমা গম্ভীর গলায় বলল, না করলেও জানি।

আমার উপন্যাসে আমি অল্প কয়েকটা চরিত্র নিয়ে আসব। যেমন, আমার পরিবারের লোকজন। বাইরের মানুষ হিসেবে থাকবেন শুধু আহসান সাহেব এবং আমার বান্ধবী প্রতিমা। আহসান সাহেব আমার বাবার বন্ধু। বাবা আরমানিটোলা স্কুলে তাঁর সঙ্গে পড়তেন। স্কুলে কিছু কিছু ছেলেদের বিশেষ বিশেষ নামে ডাকা হয়। আহসান সাহেবকে ডাকা হতো মার্বেল নামে। কারণ তিনি স্কুলে যেতেন পকেটভর্তি মার্বেল নিয়ে।

আপনারা নিশ্চয়ই একটু অবাক হচ্ছেন, কারণ আমি বাবার বন্ধুকে চাচা না বলে আহসান সাহেব, আহসান সাহেব বলছি। এর কারণ হচ্ছে, আমি ওনাকে বিয়ে করব। চমকে গেলেন না? আমার উপন্যাসের এইটাই সবচেয়ে বড় চমক। এই চমকটা শেষের দিকে আসবে। আমি যে তাঁকে বিয়ে করব বলে ঠিক করেছি এই বিষয়টা আহসান সাহেব নিজেও জানেন

না। যেদিন জানবেন সেদিন তিনিও চমক খাবেন। যাই হোক, আহসান সাহেব সম্পর্কে বলি।

চৌধুরী আহসান উদ্দিন।
বয়স : ৫৫
রাশি : বৃশ্চিক।
উচ্চতা : পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি
ওজন : জানি না।
গাত্রবর্ণ : শ্যামলা
পেশা : ইঞ্জিনিয়ার।
(একসময় ছিলেন, এখন ঘরে বসে সময় কাটান। বই পড়েন।)।
বিশেষ চিহ্ন : বাঁ চোখের ভুরুর ওপর কাটা দাগ।
চুলের বর্ণ : কালো।
চোখের বর্ণ : কালো
বৈবাহিক অবস্থা : (সমস্যা আছে)....
ধর্ম : ইসলাম।

বৈবাহিক অবস্থার জায়গায় আমি লিখেছি, সমস্যা আছে। আসলে কোনো সমস্যা নেই। ভদ্রলোকের স্ত্রী রোড অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছেন। ভদ্রলোক নিজেই। গাড়ি চালাচ্ছিলেন। হুড়মুড় করে গাড়ির ওপর একটা ট্রাক উঠে গেল। তার স্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে মারা গেলেন। তিনি নিজেও আহত হয়েছিলেন। অনেকদিন হাসপাতালে ছিলেন। এখনো সামান্য খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটেন। স্ত্রী মারা যাওয়ায় তিনি যে খুব দুঃখিত হয়েছেন তা আমি মনে করি না। স্ত্রীকে

নিয়ে তিনি কখনো। গল্প করেন না। স্ত্রীর মৃত্যুবার্ষিকীতে মিলাদ পড়ান না বা ফকির খাওয়ান না। বেচারির একটা ছবি অবশ্যি তাদের শোবার ঘরে আছে। সেখানে এই মহিলা স্বামীর হাত ধরে সমুদ্র দেখছেন। ভদ্রমহিলার মুখ খুশি খুশি, কিন্তু তার স্বামী অর্থাৎ আহসান সাহেব মুখ বেজার করে আছেন। ছবিতে তাকে দেখে মনে হয় তাঁর প্রচণ্ড বাথরুম পেয়েছে। এই মুহূর্তে বাথরুমে যাওয়া প্রয়োজন। নয়তো দুর্ঘটনা ঘটে যাবে।

আহসান সাহেবের বৈবাহিক বিষয়ে কোনো সমস্যা নেই, তারপরেও আমি কেন লিখলাম, সমস্যা আছে? এর একটা কারণ আছে। একদিন আমি ছাদে গিয়েছি আচারের বৈয়াম আনার জন্যে। আমার মার আচার বানানোর ব্যাপার। আছে। তিনি হেন বস্তু নেই যার আচার বানান না। আমাদের বাসার ছাদে সব সময় ত্রিশ থেকে চল্লিশটা, আচারের বৈয়াম থাকে। এর মধ্যে তিতা করলার আচারও আছে। মার আচারের বিষয়ে পরে গুছিয়ে বলব। এখন আহসান সাহেবের বৈবাহিক সমস্যাটা বলে শেষ করি।

উনার স্ত্রী মারা যাওয়ার আগের কথা।

আমি ছাদে গিয়ে দেখি আহসান সাহেব মোবাইল টেলিফোনে কার সঙ্গে যেন কথা বলছেন। বেশ জোরে জোরেই কথা বলছেন। আমি পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি।.উনি আস্তে বললেও শুনতে পেতাম। আমার কান খুব পরিষ্কার। কেউ। ফিসফিস করে কথা বললেও আমি শুনতে পাই। আহসান সাহেবের টেলিফোনের কথাবার্তা এ রকম—

আহসান সাহেব : আপনাকে তো একবার বলেছি। একই কথা রিপিট করে কী হবে?

ওপাশ থেকে : (শোনা যাচ্ছে না। তবে অনেকক্ষণ ধরে কথা)।

আহসান সাহেব : আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ না করে কিছু বলব না।

ওপাশ : (অল্প সময় কথা)

আহসান সাহেব : আমাকে অবশ্যই রেনুকার সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

ওপাশে : (কান্নার মতো শব্দ)

আহসান সাহেব : স্টপ ক্রায়িং প্লিজ। তোমাকে মনে রাখতে হবে, রেনুকাকে আমি ভালোবাসি বা না বাসি, তার সঙ্গে দীর্ঘদিন বাস করছি।

ওপাশ : (কী বলল বোঝা গেল না। আহসান সাহেবের বিরক্ত মুখ থেকে ধারণা করি– কথাগুলো তার পছন্দ হচ্ছে না।

আহসান সাহেব : তোমাকে ধৈর্য ধরতে হবে। পেশেন্স।

ওপাশ : (মনে হচ্ছে টেলিফোন লাইন কেটে দেওয়া হয়েছে। কারণ আহসান সাহেব কান থেকে টেলিফোন নামিয়ে বিরক্তমুখে টেলিফোনের দিকে তাকিয়ে আছেন।)

এই সময় আমি স্টেজে ঢুকে পড়লাম। অর্থাৎ উনার কাছে গেলাম। আমি মাঝে মাঝে এই ধরনের বাক্য লিখব। শুরুতে বুঝতে অসুবিধা হলেও পরে ঠিক হয়ে যাবে।

আহসান সাহেব আমাকে দেখে বললেন, হ্যালো!

আমি জবাব না দিয়ে হাসলাম। হাসার সময় মাথা সামান্য কাত করে চিন. ডাউন করে রাখলাম। মেয়েদের এই অবস্থায় সবচেয়ে সুন্দর লাগে। আমি নিজে নিজে এই তথ্য বের করি নি। ইন্ডিয়ান একটা ম্যাগাজিনে পড়েছি। ম্যাগাজিনের নাম সানন্দা। সেখানে ছবি তোলার সময় কী করতে হবে তাও লেখা আছে। ছবি তোলার সময় চীজ বলা যাবে না। জিভের আগা দিয়ে তালু ছুঁয়ে রাখতে হয়। জিভের আগা দিয়ে তালু ছুঁয়ে রাখলে মুখের চামড়া রিলাক্সড হয়। ছবি ভালো আসে। আমি দুভাবেই ছবি তুলে দেখেছি, কোনো বেশকম হয় না। তবে একটায় গালের চামড়া সামান্য ফুলে থাকে। অন্যটায় থাকে না।

আহসান সাহেব বললেন, তারপরে লিপি কী সমস্যা?

না, আমি বললাম, কোনো সমস্যা নেই।

আমার কাছে এসেছ? হ্যাঁ। বলো কী করতে পারি? আমার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করতে পারেন।

এখন সম্ভব না। আমি একটি জরুরি টেলিফোনের জন্যে অপেক্ষা করছি। কাজেই গেট লস্ট, অর্থাৎ হারিয়ে যাও।

উনার কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখে পানি এসে গেল। চোখে পানি এলে চট করে মুখ সরিয়ে নিতে হয় না। তাতে চোখে আরও বেশি করে পানি জমে। আমি একটা টেকনিক বের করেছি, এই টেকনিকে চোখে জমে থাকা পানি সঙ্গে

সঙ্গে শুকিয়ে যায়। কেউ বুঝতেই পারে না যে চোখে পানি এসেছিল। এই টেকনিক ব্যবহার করে আমি চোখের পানি শুকিয়ে ফেলে বললাম, আমি এসেছি :

জবা ফুলের ইংরেজি কী জানতে। ইংরেজিটা বললেই চলে যাব।

জবা ফুলের ইংরেজি তো তোমাকে একবার বলেছি। ভুলে গেছি। বেঙ্গলি টু ইংলিশ ডিকশনারি দেখে নাও। তাহলে আর ভুলবে না।

এই সময় তার মোবাইল টেলিফোন বেজে উঠল। মনে হয় জরুরি টেলিফোন, চলে এসেছে। আমি মুখ ভোঁতা করে চলে এলাম। তিনি টেলিফোন নিয়ে ব্যস্ত। ছিলেন বলে আমার ভোতা মুখ দেখতে পেলেন না।

আমি বেঙ্গলি টু ইংলিশ ডিকশনারি নিয়ে বসেছি। জবা ফুলের ইংরেজি নাম খুঁজছি। জবা ফুলের ইংরেজি আমি জানি–চায়না রোজ।

তারপরেও ডিকশনারি ঘাটছি, কারণ আহসান সাহেব আমাকে ডিকশনারি দেখতে বলেছেন। তিনি আমার গুরু। তিনি যা বলবেন তা-ই আমি করব। তিনি যদি বলেন, লিপি, ছাদ থেকে লাফ দিয়ে নিচে পড়ো তো।

আমি বলব, জি আচ্ছা স্যার। এক্ষুনি লাফ দিচ্ছি। আপনি শুধু বলবেন ওয়ান টু থ্রি। থ্রি বললেই ঝপ দেব।

আমাকে ডিকশনারি নিয়ে ঘাটাঘাটি করতে দেখে বাবা বললেন, কী করছিস? আমি বললাম, ডিকশনারি দেখছি। জবা ফুলের ইংরেজি কী দেখছি।

বাবা আমার দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে অন্যদিকে তাকালেন। এর অর্থ জবা ফুলের ইংরেজি তিনি জানেন না। বাবাকে আমি খুব ভালো করে চিনি। জবা.. ফুলের ইংরেজি তিনি যদি জানতেন তাহলে সঙ্গে সঙ্গে বলতেন, জবা বাংলাদেশের অতি কমন এক ফুল। এর ইংরেজি হলো, চায়না রোজ। তুমি এটা। জানো না, আশ্চর্য! স্কুলে তোমাদের কী শেখায়? ক্লাস ফাঁইভ-সিক্সের একটা মেয়ে যা জানে, তুমি তো তাও জানো না।

আমার ডিকশনারি দেখা শেষ হলো।

বাবা বললেন, পেয়েছ?

আমি বললাম, হুঁ, চায়না রোজ।

বাবা বললেন, জবা বাংলাদেশের অতি সাধারণ একটা ফুল। তুমি এর . ইংরেজি জানো না শুনে দুঃখ পেলাম। চায়না রোজ অর্থাৎ নাক চ্যাপা চিনাদের গোলাপ। একটা খাতায় দশবার লেখো চায়না রোজ। যাতে আর ভুলে না যাও।

আমি খাতা নিয়ে দশবার চায়না রোজ না লিখে লিখলাম–বাবা নিজেকে যতটা চালাক ভাবেন তিনি তত চালাক না। জবা ফুলের ইংরেজি তিনি জানতেন না। ভাব করেছেন যেন জানেন।

বাবা বললেন, লিখেছ?

আমি বললাম, হুঁ।

বাবা বললেন, এক মিনিটে লেখা হয়ে গেল? কী লিখেছ দেখাও। যদি দেখি দশবারের কম তাহলে খবর আছে।

আমি গম্ভীর মুখে বাবাকে খাতা দেখালাম। তিনি হতভম্ব হয়ে কিছুক্ষণ তাকালেন। চিৎকার চেঁচামেচি করলেন না। তিনি খাতার পাতা উল্টাতে : থাকলেন। আমি ছাদে চলে গেলাম। জবা ফুলের ইংরেজি শিখেছি, এটা আহসান সাহেবকে জানানো দরকার।

আহসান সাহেব বললেন, ডিকশনারি দেখেছ?

আমি বললাম, হুঁ। চায়না রোজ।

আহসান সাহেব বললেন, জবার আরেকটা নাম আছে। Shoe flower. অর্থাৎ জুতা ফুল। জবা ফুল জুতা কালো করার কালিতে ব্যবহার হয় বলে এই নাম। মনে থাকবে?

থাকবে।

জবার বোটানিকেল নাম হলো Hibiscus rosa. পৃথিবীর পাঁচটি দেশের জাতীয় ফুল জবা। এই মুহূর্তে আমার দুটা দেশের নাম মনে পড়ছে। একটা হলো মালয়েশিয়া, আরেকটা উত্তর কোরিয়া।

এই হলো আহসান সাহেব। হেন জিনিস নাই যে ইনি জানেন না। তাঁর বিপরীত মেরুতে বাবার অবস্থান। তিনি কিছুই জানেন না। কোনো কিছু জানার ব্যাপারে তাঁর কোনো আগ্রহ নেই। বাবার সঙ্গে আহসান সাহেবের বন্ধুত্ব কীভাবে। হয়েছে কে জানে! আহসান সাহেব দিনরাত বই পড়েন। বাবা সব মিলিয়ে দুটা বই পড়েছেন—শরৎচন্দ্রের দেবদাস আর যাযাবরের দৃষ্টিপাত। তিনি কথায় কথায় এই দুটা বইয়ের কথা বলেন। দৃষ্টিপাত থেকে কোটেশান দেন। যেমন, বিজ্ঞান মানুষকে দিয়েছে বেগ, কেড়ে নিয়েছে আবেগ।

বাবা তার বন্ধু আহসান সাহেব সম্পর্কে বলেন, বিস্তর পড়াশোনা করেছে। তাতে লাভ কী? যা হয়েছে এর নাম বুকিশ নলেজ। বুকিশ নলেজ কোনো কাজে আসে না।

আমার মাঝে মাঝে বাবাকে বলতে ইচ্ছা করে, তোমার নলেজ কোন লাইনে? তোমার নলেজ, কীভাবে কাজে এসেছে?

মেয়ে হয়ে বাবাকে এইসব কথা বলা যায় না। সন্তান ও পিতার সম্পর্ক নিয়ে বাবা মাঝে মাঝে হাদিস থেকে উদাহরণও দেন। সেদিন বললেন, আল্লাহ যদি। তাকে ছাড়া অন্য কাউকে সেজদা করার অনুমতি দিতেন সেটা হতো, সন্তান। পিতাকে সেজদা করবে। এখন বুঝে দেখো পিতার মর্যাদা। মাতার চেয়ে পিতা টেন টাইমস ওপরে।

হাদিস জানা ভালো কোনো আলেম পাওয়া গেলে তাকে জিজ্ঞেস করতাম– এই হাদিস সঠিক কি না। বাবা প্রায়ই হাদিস আওড়ান। আমার ধারণা, বেশিরভাগই বানানো। তাকে আমি কখনো হাদিস-কোরান পড়তে দেখি নি। বাবার বলা হাদিসগুলি আসলেই যাচাই করা দরকার।

আমাদের স্কুলের যে হুজুর আপা আছেন তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ভালো না। সম্পর্ক ভালো থাকলে তাকে জিজ্ঞেস করতাম। হুজুর আপার সঙ্গে আমার সম্পর্ক খারাপ হয়েছে কীভাবে সেটা বলি। গত রোজার সময় তাকে জিজ্ঞেস করলাম,

আপা! জ্বিনরা কি খাবার খায়?

আপা বললেন, খায়। তারা মানুষের মতোই এক ধরনের প্রাণী। তাদেরও . . খাদ্যের প্রয়োজন আছে।

আমি বললাম, তারা কী খাবার খায়?

আপা বললেন, মৃত পশুর হাড়, কয়লা, এইসব তাদের খাদ্য।

আমি বললাম, আপা, জ্বিনদের মধ্যে মুসলমান আছে?

আপা বললেন, আছে। আমাদের নবিজি (সঃ)-এর কাছে অনেক জ্বিন ইসলাম গ্রহণ করেছে।

আমি বললাম, তাহলে তারা রোজা নিশ্চয় রাখে?

আপা বিরক্ত হয়ে বললেন, এইসব জানতে চাচ্ছ কেন?

আমি মুখ শুকনা করে বললাম, আপা, আমি একটা উপন্যাস লিখছি। সেখানে ধার্মিক জ্বিনের একটি চরিত্র আছে। এইজন্য জানতে চাচ্ছি।

হুজুর আপা হেড মিসট্রেসের কাছে আমার নামে নালিশ করলেন। হেড মিসট্রেস আমাকে ডেকে পাঠালেন। কঠিন গলায় বললেন, লিপি, তোমার সমস্যা কী?

আমি বললাম, আপা, আমার কোনো সমস্যা নেই।

তুমি নাকি জ্বিনদের নিয়ে উপন্যাস লিখছ?

জ্বিনদের নিয়ে কিছু লিখছি না। তাদের বিষয়ে কিছু জানি না। আমার উপন্যাসে একজন ধার্মিক জ্বিনের চরিত্র আছে। এইজন্য জানতে চাচ্ছিলাম।

হেড মিসট্রেস বললেন, তোমার নামে অনেক কমপ্লেন আছে। তোমার বাবাকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবে। আগামী সোমবার চারটার পর আসতে বলবে।

আমি বললাম, জি আচ্ছা।

খারাপ মেয়ে আমি স্কুলে রাখব না। টিসি দিয়ে বের করে দেব। বুঝেছ? জি আপা।

আপা বললেন, বাথরুমে অতি নোংরা কিছু ছবি আঁকা হয়েছে। সেগুলি কি তোমার আঁকা?

আমি বললাম, জি-না। তবে কে এঁকেছে আমি জানি। (আসলেই জানি। ছবিগুলি এঁকেছে প্রতিমা।)

আপা চোখ মুখ সরু করে বললেন, বলো কে এঁকেছে?

আমি বললাম, কোনো এক দুষ্ট জ্বিন এঁকেছে। দুষ্ট জ্বিনরা এই ধরনের কাজ করে।

আপা বললেন, সোমবার অবশ্যই তুমি তোমার বাবাকে নিয়ে আসবে।

.

সোমবারে বাবা হেড মিসট্রেসের সঙ্গে দেখা করলেন। বেশ অনেকক্ষণ থাকলেন। আমি বারান্দায় হাঁটাহাঁটি করতে লাগলাম। যদি আমার ডাক পড়ে! ডাক পড়ল না। বাবা মুখ শুকনা করে বের হলেন। আমরা দুজন রিকশা নিয়ে ফিরছি। বাবা _ বললেন, তুমি নাকি জ্বিন নিয়ে বই লিখছ?

আমি বললাম, জ্বিন নিয়ে বই কি লিখব? ওদের বিষয়ে কি জানি?

বাবা বললেন, সেটাও তো কথা। মা শোনো, শিক্ষকদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে হবে। পিতা-মাতার পরেই শিক্ষকের মর্যাদা। এই বিষয়েও নবিজির একটা হাদিস আছে।

আমি বললাম, হাদিস শুনতে ইচ্ছে করছে না। আইসক্রিম খেতে ইচ্ছে করছে, আইসক্রিম কিনে দাও। দুটা ললি আইসক্রিম কিনে আনো। দশ টাকা দাম।

রাস্তার মাঝখানে আইসক্রিম কোথায় পাব?

ওই যে আইসক্রিমের গাড়ি। দুটা কিনবে। আমি দুই হাতে দুটা আইসক্রিম নিয়ে খেতে খেতে যাব।

বাবা বললেন, হেড মিসট্রেস ঠিকই বলেছেন, তোমার মাথায় সমস্যা আছে।

বাবা আইসক্রিম কিনে আনলেন। আমি একটা তার হাতে দিয়ে বললাম, একটা তুমি খাবে আরেকটা আমি খাব। বাবা মেয়ে দুজন আইসক্রিম খেতে খেতে যাব।

আমি যা ভেবেছিলাম তা-ই হয়েছে। বাবা আইসক্রিম খেতে খেতে যাচ্ছেন। তার চোখে পানি এসে গেছে। আমার উপন্যাসে এরকম একটা দৃশ্য থাকবে। একটা না, অনেকগুলি দৃশ্যই থাকবে।

বাবা শার্টের হাতায় চোখ মুছলেন। আমি বললাম, কাঁদছ কেন?

বাবা বললেন, কাঁদব কী জন্যে? চোখ উঠবে। চোখ ওঠার আগে আগে চোখ, দিয়ে পানি পড়ে।

ও আচ্ছা।

বাবা বললেন, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের সবার চোখ উঠেছিল। এই রোগের তখন নামই হয়ে গেল, জয় বাংলা রোগ।

আমি বললাম, বাবা! তুমি মুক্তিযুদ্ধের গল্প ফাঁদার চেষ্টা করছ। রিকশায় যেতে যেতে মুক্তিযুদ্ধের গল্প শুনব না।

বাবা কিছু বললেন না। আমি লিখতে ভুলে গেছি–বাবা একজন মুক্তিযোদ্ধা। সিলেট এলাকায় যুদ্ধ করেছেন। তাদের কমান্ডার ছিলেন সালেহ চৌধুরী। বাবার প্রধান আনন্দ মুক্তিযুদ্ধের গল্প বলা। এই আনন্দ তিনি তেমন পান না। কারণ আমরা তাঁকে গল্প শুরু করতে দেই না। শুরুতেই থামিয়ে দেই।

বারার আইসক্রিম শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু তার হাতে কাঠি রয়ে গেছে। বাচ্চাদের মতো হাতে কাঠি নিয়ে বসে আছেন।

বাবা!

হুঁ।

তোমাদের টেকেরঘাট অপারেশনের গল্পটা বলো তো।

সত্যি শুনতে চাও?

হুঁ। চাই।

গল্প তো শুনতে চাও না?

এখন চাই।

অপারেশন আসলে টেকেরঘাটে হয় নি। হয়েছে, জলকলসে।

ও আচ্ছা।

আমি কোন সেক্টরে ছিলাম তা তো জানো?

জানি। পাঁচ নম্বর সেক্টরে।

ঘটনা হলো কী, ভোরবেলায় সালেহ চৌধুরী সাহেব হঠাৎ বললেন, সবাই তৈরি হও। লঞ্চে ওঠো। লঞ্চের নামটা কি আগে বলেছি?

বলেছ। লঞ্চের নাম পাখি।

বাবা গল্প শুরু করলেন। আমি এখন আর তার কথা শুনছি না। অন্যকিছু ভাবছি। এই কাজটা আমি খুব ভালো পারি।

ক্লাসে আপারা যখন বক্তৃতা শুরু করেন, আমি অন্য কথা ভাবি।

এখন রিকশায় একই ব্যাপার ঘটছে। বাবা আইসক্রিমের কাঠি হাতে নিয়ে উত্তেজিত গলায় কথা বলে যাচ্ছেন, আর আমি ভাবছি প্রতিমার কথা।

প্রতিমা নতুন প্রজেক্ট হাতে নিয়েছে। এই প্রজেক্টে আমাদের অংক আপাকে মাসে দুটা করে উড়ো চিঠি ছাড়া হচ্ছে। আমাদের অংক আপার চেহারা রাক্ষসীদের মতো। মুখভর্তি হলুদ চোখা চোখা দাঁত। বয়স চল্লিশের ওপরে। এখনো বিয়ে হয় নি। এই রাক্ষসীকে কে বিয়ে করবে!

অংক আপা স্কুলে সেজেগুজে আসেন। ঠোঁটে কড়া লিপস্টিক দেন। গ্রামের মেয়েদের মতো গালে রুজ মেখে গাল লাল করেন। কী কুৎসিত যে তাঁকে দেখায়! আমার ধারণা সাজগোজের পর তিনি আয়নায় নিজেকে দেখেন না। দেখলে কখনোই সাজতেন না।

অংক আপাকে যে চিঠি পাঠানো হয়েছে তার নমুনা (হুবহু হবে না। একবার মাত্র পড়েছি। প্রতিমা চিঠি পাঠিয়েছে সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিসে।)–

ওগো আমার ময়না সোনা। লুতু লুতু পুতু পুতু।

তুমি যে কমলা আর বেগুনি ফুলের ছাপের শাড়ি পরে স্কুলে এসেছ, দূর থেকে দেখে আমি মোহিত হয়েছি। কী সুন্দর যে তোমাকে লাগছে চাঁদ সোনা! লুতু লুতুপুতু পুতু।.. .

আচ্ছা ভালো কথা, তোমার ডান স্তনটা কি বাঁয়ের চেয়ে বড়? আমার সে রকমই মনে হয়। তুমি ডান দিকে সামান্য ঝুঁকে হাঁট। ডান স্তনের অতিরিক্ত ভারেই কি এই অবস্থা?

চিঠির কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ আমি শব্দ করে হেসে ফেললাম। বাবা অবাক হয়ে বললেন, হাসছ কেন? আমি তো হাসির কোনো কথা বলি নাই। আমাদের একজন সহযোদ্ধা পেটে গুলি খেয়েছে। এখন মরে তখন মরে অবস্থা। এই কথা শুনে হাসির কী আছে বুঝলাম না।

আমি বললাম, বাবা সরি।

বাবা বললেন, সরি পরে, আগে বলো তুমি হেসেছ কেন? চুপ করে থাকলে হবে না। জবাব দিতে হবে। এমন কি হতে পারে যে, আমি কী বলছি তা তুমি শুনছ না। অন্য কিছু ভাবছ?

হতে পারে, তবে তোমার প্রতিটি কথা আমি শুনেছি।

বলো দেখি, টেকেরঘাট সাব সেক্টরে আমাদের উপদেষ্টার নাম কী?

আমি বললাম, মেজর জগজিৎ সিং বাথ।

বাবার চেহারা কোমল হয়ে গেল। তিনি বললেন, গুড গার্ল।

বাবার কথা সত্যি না। আমি গুড গার্ল না। আমি ব্যাড গার্ল। কেমন ব্যাড গার্ল উদাহরণ দেব? আচ্ছা দেই।

একজন ব্যাড গার্লের লক্ষণ হচ্ছে, সে তার খুব কাছের মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করে। এই যে বাবার সঙ্গে করলাম। মার সঙ্গে তো সব সময় করছি। সবচেয়ে বেশি আহসান সাহেবের সঙ্গে। দাবা খেলা নিয়ে প্রতারণা। আহসান। সাহেবের ধারণা তিনি খুব ভালো দাবা খেলেন। আসলে তা না। আমার সঙ্গে জেতার তার কোনোই সম্ভাবনা নেই, অথচ আমি ইচ্ছা করে হেরে গিয়ে তাঁকে আনন্দ দেই। খেলায় জিতে তিনি জ্ঞানগর্ভ কথাবার্তা বলেন। এইসব কথা শুনতে আমার ভালো লাগে। তার জ্ঞানী কথার নমুনা—

লিপি, তোমাকে দেখেই মনে হচ্ছে তুমি খুব মন খারাপ করেছ। ফুটবল খেলায় হেরে যাওয়ার অর্থ শক্তির কাছে হার। দাবায় হার মানে বুদ্ধির কাছে হার। মন খারাপ হবেই। এটা স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া।

আমি প্রতিবারই বলি, আপনার কাছে তো আমি হারবই।

তিনি বলেন, আগেই হার স্বীকার করে থাকবে না। চেষ্টা করবে। তোমার Opening খারাপ না। End game খারাপ। দাবার মূল খেলা হচ্ছে end game. কিছু কৌশল আমি তোমাকে শিখিয়ে দেব। ঠিক আছে?

জি। ঠিক আছে।

ববি ফিসারের নাম শুনেছ?

জি-না।

আমেরিকান দাবা খেলোয়াড়। Legand. দাবার জগতে হুলুস্থুল করে গেছেন। End game এর ওপর লেখা তার একটা বই আছে। আমার কাছ থেকে নিয়ে পড়বে।

আচ্ছা।

এখন তোমাকে শেখাব Fools Mate। কী করে বোকা খেলোয়াড়কে তিন দানে হারানো যায়।

তিনি আমাকে Fools Mate শেখালেন। আমি মনে মনে হাসলাম। আমি জানি, তিন দানে তাকে হারানো যাবে না, কিন্তু কুড়ি দানে অবশ্যই যাবে।

দাবার গ্র্যান্ড মাস্টার নিয়াজ মোরশেদের সঙ্গে আমি এই পর্যন্ত তিনবার খেলেছি। প্রথম খেলায় তিনি জিতেছেন, বাকি দুটায় ড্র হয়েছে। প্রথমটায় উনি জিততে পারতেন না। একজন গ্র্যান্ড মাস্টারের সঙ্গে খেলছি, এই মানসিক উত্তেজনাই আমার কাল হয়েছে।

দাবা খেলা থেকে আমার শিক্ষা হচ্ছে, মানসিক উত্তেজনা একপাশে সরিয়ে খেলতে হবে। দৃষ্টি থাকবে বোর্ডের সেন্টারের দিকে। সেন্টারের দখল যেন কখনো হাতছাড়া না হয়। ক্যাসলিং করে রাজা লুকানো যাবে না। যুদ্ধের মাঠে। লুকানোর প্রশ্ন ওঠে না।

আমার উপন্যাসের নায়িকা হবে একজন দাবাড়ু। দাবার প্রতিভা সে কখনোই প্রকাশ করবে না। সব প্রতিভা প্রকাশ করতে নেই।

আমার উপন্যাসে নায়ক একজন, তবে নায়িকা থাকবে দুজন। একজন। আমি, অন্যজন প্রতিমা। আমি নায়ককে আকর্ষণ করব বুদ্ধি দিয়ে, প্রতিমা করবে শরীর দিয়ে।

উপন্যাস লেখার বিষয়ে আমি প্রতিমার সঙ্গে আলাপ করেছি। সে খুব উৎসাহী। আমাকে বলল, শুরুতে একটা সেক্স সিন দিয়ে দে। তাহলে পাবলিক খাবে।

আমি বললাম, সেক্স সিন আমি লিখতে পারব না।

প্রতিমা বলল, আমি লিখে দেব। যে পড়বে সে-ই ট্যারা হয়ে যাবে।

আহসান সাহেবের সঙ্গে আমি প্রতিমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছি। এক ছুটির দিনে প্রতিমাকে তাঁর কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম।

প্রতিমা তাকে দেখে ভক্তি-শ্রদ্ধায় গলে যাওয়ার মতো ভাব করল। একেবারে পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম।

আমি বললাম, এর নাম প্রতিমা। আমার প্রিয় বন্ধু। আপনার কথা অনেক। বলেছি তো, সে আপনাকে দেখতে এসেছে।

আহসান সাহেব প্রতিমার মাথায় হাত রেখে বললেন, কেমন আছ গো মা?

আনন্দের ব্যাপার হচ্ছে, আহসান সাহেব কখনো আমাকে মা ডাকেন না! কোনো পুরুষ যদি কোনো মেয়ের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে, তাকে সে কখনো মা ডাকবে না। ইহা সত্য, ইহা সত্য, ইহা সত্য।

২. আজ শুক্রবার

আজ শুক্রবার। সকাল আটটা বাইশ। আমি উপন্যাস নিয়ে বসেছি। উপন্যাসের প্রথম পাতাটা লিখব। আহসান সাহেব বলেছেন, প্রথম পাতা লেখাই কঠিন। কোনোরকমে প্রথম পাতা লেখার পর কলমের নিয়ন্ত্রণ চলে যায় অন্যকারও হাতে। তখন আর লিখতে সমস্যা হয় না।

আমি বললাম, অন্যকারও হাতে মানে কী? অন্যকেউটা কে?

আহসান সাহেব বললেন, লেখকরা কেউই পরিষ্কার করে কিছু বলেন না। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, অন্যকেউটা হলো তার জীবনদেবতা। পুশকিন বলেছেন, অন্যকেউটা তার অদৃশ্য বন্ধু।

জ্ঞানের কথা বাদ। লেখা শুরুর আগে বাসার পরিবেশ বর্ণনা করি। আহসান সাহেব বলেছেন, যে পরিবেশে লেখা হয়, সেই পরিবেশ লেখাতে ছাপ ফেলে। বাসার পরিবেশ হচ্ছে–বাবা কাঁচাবাজারে গেছেন। শুক্রবারে তিনি সাপ্তাহিক বাজার করেন। এই দিন দুপুরে বাসায় ভালো রান্না হয়। খিচুড়ি-মাংস কিংবা মোরগপোলাও। গত সপ্তাহে মোরগপোলাও হয়েছে, আজ মনে হয় খিচুড়ি-মাংস হবে। খিচুড়ি আমার অপছন্দ। ডালমাখা ভাত যা, খিচুড়িও তা। আমার অপছন্দের কথা ছোটবেলায় বলতাম, এখন আর বলি না। অখাদ্য খিচুড়ি সোনামুখ করে খেয়ে ফেলি।

মা ব্যস্ত আছেন দেয়ালের ঝুল পরিষ্কারে। সকিনা (আমাদের কাজের মেয়ে) লম্বা লাঠির মাথায় ঝাড়ু বেঁধে ঘরের ঝুল পরিষ্কার করছে এবং কিছুক্ষণ পরপর খিকখিক করে হাসছে।

সকিনার হাসার জন্যে কোনো কারণ লাগে না। যে কোনো কিছুতেই সে হাসতে পারে। হাসির কারণে একবার তার চাকরি নট হয়ে গিয়েছিল। আর কোনো কাজের মেয়ে পাওয়া যাচ্ছিল না বলে বাবা পাঁচ দিনের মাথায় নিজে আগারগাঁওয়ের বিএনপি বস্তি থেকে তাকে নিয়ে এসেছিলেন। ঘটনাটা বলে নেই।

বড় মামা বেড়াতে এসেছেন। তিনি আইডিয়েল কলেজের ইসলামের ইতিহাসের শিক্ষক। অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। বেশিরভাগ সময় উপদেশমূলক জ্ঞানের কথা বলেন। আমি তাকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করি। কারণ দেখা হলেই তিনি প্রশ্ন করে বসবেন। না পারলে কঠিন চোখে তাকিয়ে থেকে বলবেন, হেসে খেলে জীবন পার করলে তো চলবে না। একটু সিরিয়াস হও। Young lady, life is not a bed of roses. এটা সব সময় মনে রাখবে।

ওই দিনের ঘটনা হচ্ছেবড় মামা এসেছেন। তাঁর পছন্দের ইজিচেয়ারে বসেছেন। গম্ভীর গলায় ডাকলেন, লিপি মা কোথায়? আমি বেজার মুখে তার সামনে দাঁড়ালাম। তিনি বললেন, তুরস্কের কামাল আতার্তুক সম্বন্ধে কী জানো বলো।

আমি বললাম, কিছুই জানি না মামা।

কিছুই জানো না?

জি-না।

আমাদের জাতীয় কবি নজরুল যে আতাতুর্ককে নিয়ে একটা কবিতা লিখেছেন তার কয়েক লাইন বলতে পারবে?

আমি বললাম, না।

বড় মামা কঠিন চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। এই সময় সকিনা চায়ের কাপ নিয়ে এল। সে বড় মামার হাতে চায়ের কাপ দিতে যাচ্ছে, তখন বড় মামা বেশ শব্দ করে ... দিলেন। কী দিলেন তা কি বোঝা যাচ্ছে? ইংরেজিতে বলে Fart। শব্দটা করে বড় মামা মুষড়ে পড়লেন।

সকিনা বাড়ি কাঁপিয়ে হেসে ফেলে হাতের চায়ের কাপ ফেলে দিল। গরম চা পড়ল মামার পায়ে। করেছিস কী!–বলে মামা একটা চিৎকার দিলেন। মা রান্নাঘর থেকে কী হয়েছে? কী হয়েছে? বলে ছুটে এলেন।

আমি খুব শান্ত মুখে বললাম, কিছু হয় নি মা। বড় মামা একটা পাদ দিয়েছেন। এই যা, শব্দটা বলেই ফেললাম! তবে মূল উপন্যাসে আমি এই ধরনের শব্দ অবশ্যই ব্যবহার করব না। মূল উপন্যাসে এই ঘটনা থাকলে আমি লিখব, কিছু হয় নি মা। বড় মামা শব্দ করে গ্যাস ছেড়েছেন। আচ্ছা এই প্রসঙ্গ থাক। আমি উপন্যাস লেখার সময় বাসার পরিস্থিতি বর্ণনা আগে শেষ করি।

আমার ছোটভাই রুবেল বসার ঘরে গাড়ি চালাচ্ছে। তার বয়স নভেম্বরে চার হবে। সে ভয়ঙ্কর জেদি। বেশির ভাগ সময় গাড়িটায় বসে দুই পায়ে ভর দিয়ে গাড়ি চালায়। মুখে ভরর ভরর শব্দ করে। কিছুক্ষণ পরপর সোফায় বা দেয়ালে ইচ্ছা করে গাড়ি ধাক্কা লাগিয়ে

বলে অ্যাক্সিডেন্ট। গাড়িটা বড় মামা তাকে তৃতীয় জন্মদিনে উপহার দিয়েছেন। এই গাড়ির বিশেষত্ব হচ্ছে, এর পেছনের ডালা খোলা যায়। রুবেল অনেক কিছু এখানে লুকিয়ে রাখে। বাসায় যখন কোনো কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না, তখন রুবেলের গাড়ির ডালা খুললে সেটা পাওয়া যায়। এ পর্যন্ত যেসব জিনিস পাওয়া গেছে তা হলো–

১. বাসার চাবি।

২. বাবার পার্কার কলমের মুখো।

৩. শ্যাম্পুর বোতল।

৪. রান্নাঘর থেকে নেওয়া ফলকাটার ছুরি।

৫. পাঁচ ছটা কচুর মুখি।

৬. বাবার ইনসুলিনের সিরিঞ্জ।

৭. একটা চায়ের কাপ।

দুতিন পৃষ্ঠার তালিকা দিতে পারি। সাতটার নাম দিলাম যাতে রুবেলের বিচিত্র জিনিস সংগ্রহের বিষয়টি বোঝা যাবে। আমার উপন্যাসে রুবেলের গাড়ির বড় ভূমিকা আছে। যথাসময়ে তা পরিষ্কার হবে।

বলতে ভুলে গেছি, আমি উপন্যাসের নাম বদলে দিয়েছি। এখন নাম দাঁড়কাকের সংসার। নামটা অদ্ভুত না? মাঝে মাঝে তব দেখা পাই নাম শুনলেই পাঠক বুঝে ফেলবে, এটা একটা প্রেমের উপন্যাস। শুরুতেই ব্যাপারটা আমি পাঠককে বোঝাতে চাচ্ছি না। তবে নামকরণের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনো নেওয়া হয় নি। আমি একজন ঔপন্যাসিকের সাহায্য চাইব। তিনি হিমু, মিসির আলি লেখেন। তাঁর নাম হুমায়ূন আহমেদ। আমাদের স্কুলের অনেক মেয়ে তাঁকে ডাকে হুমায়ূন হাফমেড। আহমেদের বদলে হাফমেড। তিনি নাকি অর্ধেক পাগল।

তবে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। তার বাসার টেলিফোন নম্বরে গত শুক্রবার টেলিফোন করেছিলাম। একজন টেলিফোন ধরে বলল, স্যার রেস্টে আছেন। আমি দুপুর বারোটায় আবার টেলিফোন করলাম। ওই লোক আবার টেলিফোন ধরে বলল, স্যার রেস্টে আছেন।

আমি বললাম, রেস্টে আছেন মানে কী?

ঘুমাচ্ছেন।

সারা দিন ঘুমালে লেখালেখি কখন করবেন?

ওই লোক টেলিফোন রেখে দিল। আমি বিকাল চারটায় আবার টেলিফোন করলাম। আগের লোকই টেলিফোন ধরে বলল, স্যার রেস্টে আছেন।

আমি গলার স্বর গম্ভীর করে বললাম, আপনার স্যারকে গিয়ে বলুন আমার নাম শাহানা খানম। আমি ডিবি পুলিশের ইন্সপেক্টর।

সে বলল, ম্যাডাম, লাইনে থাকুন। অনেকক্ষণ কানে টেলিফোন ধরে রাখার পর সে এসে আগের মতোই বলল, স্যার রেস্টে আছেন। আমি বললাম, আপনি কি উনাকে বলেছিলেন যে, আমি ডিবি পুলিশের ইন্সপেক্টর?

বলেছিলাম।

উনি কী বললেন?

স্যার বলেছেন, ডিবি পুলিশের আমি কেঁথা পুড়ি।

এরপর আর টেলিফোন করার অর্থ হয় না। আমি বুঝে গেছি টেলিফোনের লাইনে হবে না। অন্য কোনো লাইন ধরতে হবে। এখনো কোনো বুদ্ধি মাথায় আসছে না, তবে এসে যাবে।

আমি উপন্যাসের প্রথম লাইন লেখার জন্যে তৈরি হয়েছি। কলম হাতে নিয়ে তিনবার বললাম, রাব্বি জেদনি এলমান। এর অর্থ হচ্ছে, হে রব। আমাকে জ্ঞান দাও। পড়াশোনা বা লেখালেখি-বিষয়ক কর্মকাণ্ড শুরু করার আগে তিনবার এই দোয়া পাঠ করলে সাফল্য আসে। এই বিষয় আমাকে বলেছেন হুজুর একরাম।

বাবা হুজুর একরামকে রেখেছিলেন আমাকে কোরান মজিদ পড়া শেখানোর জন্যে। উনার সুফি নুরানি চেহারা। কথাবার্তা অতি মোলায়েম। ও আল্লা, একদিন পড়ার সময় দেখি তিনি পা দিয়ে আমার ডান পা ঘষছেন। আমি পা সরিয়ে নিলাম না। কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে বসে থাকলাম, তারপর বললাম, হুজুর! আমার বাঁ পা বেশি চুলকাচ্ছে। বাঁ পাটা আগে চুলকে দিন। তারপর যত ইচ্ছা ডান পা চুলকাবেন। হুজুর পা সরিয়ে নিলেন।

আমি মাকে ঘটনা বললাম। মা বললেন বাবাকে। বাবা আমাকে ডেকে পাঠালেন। কঠিন মুখ করে বললেন, লিপি, তোমার মনে আছে পাপ। আজকালকার মেয়েদের মন কলুষিত। পায়ের সঙ্গে পা লেগে গেছে এইটা নিয়ে তুমি দেনদরবার শুরু করেছ। তোমাকে থাপড়ানো দরকার। মানি লোকের মান রক্ষা করবে তা না, উল্টা অপবাদ। সামনে থেকে যাও। পড়া ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা!

আমি যথারীতি হুজুরের সঙ্গে পড়া শুরু করলাম, তবে দ্বিতীয় দিনে জুতা পরে বসেছি। জুতার আগা দিয়ে কষে তার পায়ে গুতা দিলাম। তিনি আউ বলে চিৎকার দিলেন। কিছুক্ষণ পর আরেক গুঁতা। হুজুর উঠে দাঁড়ালেন। এরপর তিনি। আর বাসায় আসেন নি। তবে আমি কিন্তু কোরানপাঠ শিখেছি। মার কাছে শিখেছি। মা বলেছেন আমার গলার স্বর মিষ্টি। আমার কোরানপাঠ শুনলে তার নাকি চোখে পানি আসে। মার কথা সত্যি হতে পারে। অতি অল্পতেই তাঁর চোখে পানি আসে।

সুসংবাদ! উপন্যাসের প্রথম কয়েক লাইন লিখে ফেলেছি–

আমাদের বাড়ির রেলিংয়ে একটা দাঁড়কাক এসে বসেছে। দাঁড়কাকটা সাইজে যথেষ্ট বড়। তার চোখ টকটকে লাল। কাকদের স্বভাব হচ্ছে অকারণে কা কা করে। এই কাকটা সে

রকম না। সে ঘাড় ঘুরিয়ে আমাদের বাসা দেখছে। কাকা করার ক্ষমতা মনে হয় তার নেই। মানুষের মধ্যে যেমন বোবা। আছে, কাকদের মধ্যেও থাকতে পারে।

আমার ছোটভাই রুবেল মুখে ভরর ভরর শব্দ করে তার গাড়ি নিয়ে রেলিংয়ে ধাক্কা দিয়ে বলল, অ্যাক্সিডেন্ট। দাঁড়কাকটার উড়ে যাওয়ার কথা, সে উড়ে গেল না। তার স্বরে ডেকে উঠল, কা কা। এতে ভয় পেয়ে রুবেল বিকট শব্দে কেঁদে উঠল।

আমি আরও কিছুটা লিখতাম, এর মধ্যে মুখ প্যাঁচার মতো করে বাবা কাঁচাবাজার থেকে ফিরলেন। তিনি একগাদা বাজার করেছিলেন। একটা হাঁস কিনেছিলেন। দাম দেওয়ার সময় হঠাৎ হাঁসটা হাত থেকে ছুটে গেল। বাবা বাজার ফেলে হাঁস ধরতে গেলেন। হাঁস ধরতে পারলেন না। বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে এসে দেখেন তার বাজারের ব্যাগ নেই। মানুষের আম যায় ছালা যায়, বাবার হাঁস গেছে বাজার গেছে। এটা কি নতুন বাগধারা হতে পারে না? আহসান সাহেব বলেছেন, লেখকদের নতুন নতুন শব্দ তৈরি করতে হয়। বাগধারা তৈরি করতে হয়। রবীন্দ্রনাথ অনেক নতুন শব্দ বাংলা ভাষাকে দিয়েছেন। যেমন– বাগানবিলাস, উদয়পদ্ম, নীলমণিলতা।

আমি নিজে কয়েকটা নতুন শব্দ বের করেছি। আমার উপন্যাসে শব্দগুলো দিয়ে দেব। শব্দগুলো এবং তার মানে–

ক : গরবত (গরবত হলো গরম শরবত)
খ : শীরবত (শীরবত হলো শীতল শরবত)
গ : ফামানুষ (ফাজিল মানুষ)।
ঘ : জ্ঞামানুষ (জ্ঞানী মানুষ। যেমন, আহসান সাহেব)

সূচিপত্র

৬ : তর্কি (যে তর্ক করতে ভালোবাসে। যেমন, আমি।)

চ : নোংরি (যে মেয়ে নোংরা কথা বলতে পছন্দ করে। যেমন, প্রতিমা।)

উপন্যাসের আরও খানিকটা লেখা যেত, এর মধ্যে মা ইশারা করে আমাকে রান্নাঘরে যেতে বললেন। মা যখন বাবার আড়ালে কিছু বলতে চান, তখন তিনি রান্নাঘরে চলে যান। আমি রান্নাঘরে চলে গেলাম। মা গলা নামিয়ে বললেন, তোর বাবার শুধু যে হাঁস আর বাজার গেছে তা না, পকেটমারও হয়েছে। রিকশায় উঠে দেখে পাঞ্জাবির পকেটে মানিব্যাগ নেই।

কত টাকা ছিল?

এক হাজার টাকার একটা নোট আর কিছু খুচরা টাকা। তোর বাবা মন খারাপ করে বিছানায় শুয়ে আছে।

মন খারাপ করারই কথা।

তুই একটা কাজ করতে পারবি? তোর বাবার হাঁসের মাংস দিয়ে খিচুড়ি খাওয়ার শখ ছিল। তুই একটা হাঁস কিনে আনতে পারবি? হাঁস আর পোলাওয়ের চাল।

পারব। টাকা দাও।

মা বললেন, তুই খুবই লক্ষ্মী একটা মেয়ে।

আমি টাকা নিয়ে বাসার গেট থেকে বের হতেই আহসান সাহেবের সঙ্গে দেখা। তিনি গাড়ি থেকে নামছেন। উনার একটা কালো রঙের টয়োটা গাড়ি আছে। ড্রাইভার গাড়ি চালায়। ড্রাইভারের নাম কিসমত। আহসান সাহেব বললেন, লিপি, কোথায় যাচ্ছ?

আমি বললাম, হাঁস কিনতে যাচ্ছি। বাসায় আজ হাঁস এবং খিচুড়ি রান্না হবে।

তোমাকে হাঁস কিনতে যেতে হচ্ছে কেন? তোমার বাবা কোথায়?

বাবা বিছানায় শুয়ে আছেন। তাঁর মনে হয় শরীর খারাপ।

হাঁস আর কী লাগবে?

হাঁস আর পোলাওয়ের চাল।

আহসান সাহেব বললেন, তোমাকে হাঁস কিনতে যেতে হবে না। তুমি আমার ঘরে আসো, একদান দাবা খেলব। কিসমত হাঁস আর পোলাওয়ের চাল নিয়ে আসবে।

আমি বললাম, কিসমত ভাইকে টাকা দিতে হবে না?

আহসান সাহেব হেসে ফেলে বললেন, না।

ড্রাইভার কিসমত ভাইকে নিয়ে আমার একটা গল্প আছে। একদিন ঝুম বৃষ্টি হচ্ছে। স্কুলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি, বাসায় কীভাবে ফিরব বুঝতে পারছি না। থম বৃষ্টির সময় ঢাকা শহরে কোনো রিকশা পাওয়া যায় না।

বৃষ্টিতে ভিজে আমি ফিরতে পারি, আমার ভালোই লাগবে। সমস্যা একটাই, মা-পায়জামা ভিজে গায়ের সঙ্গে লেপটে থাকবে। সবাই তাকিয়ে দেখবে।

পুরুষমানুষের চোখ আনন্দে চকচক করবে। আমি কী করব ভাবছি, হঠাৎ দেখি কিসমত ভাই। আমি এগিয়ে গেলাম। কিসমত ভাই বললেন, আফা! স্যার গাড়ি পাঠাইছে।

আমি গম্ভীর গলায় বললাম, ও আচ্ছা।

কিসমত ভাই গাড়ির দরজা খুলে দিলে আমি উঠে পড়লাম। আমার একবারও মনে হলো না–কোনোদিনও আমার জন্য গাড়ি পাঠানো হয় নি, আজ পাঠানো হলো কেন? এমন তো হতে পারে কিসমত আমাকে গোপনে কোনো আস্তানায় নিয়ে যাবে।

বরং আমার মনে হলো, আহসান সাহেব আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। সাভারে তাঁর বাগানবাড়ির মতো বাড়ি আছে। আমি সেখানে যাব। তাতে আমার কোনো সমস্যা নেই। যাকে বিয়ে করব তার সঙ্গে বিয়ের আগে কিছু সময় কাটাতে অসুবিধা কী?

কিসমত ভাই বলল, আফা গান ছাড়ব?

আমি বললাম, হুঁ।

গাড়িতে গান হচ্ছে, শচীন কর্তার ডাকাতিয়া বাঁশি। আমি ভাবছি–বাহ ভালো তো, আমার জীবনের সঙ্গে মিল আছে। ডাকাতিয়া বাঁশি বাজছে, আমি চলে যাচ্ছি সাভারে।

ও আল্লা! গাড়ি আমাদের বাসার সামনে থামল। আমি সামান্য মন খারাপ করেই আহসান সাহেবের ঘরে স্কুল-পোশাক পরেই গেলাম। তিনি ইজিচেয়ারে বসে বই পড়ছিলেন। আমাকে দেখে বই থেকে চোখ না তুলেই বললেন, গাড়ি গিয়েছিল?

আমি বললাম, হুঁ।

আহসান সাহেব বললেন, বৃষ্টি দেখে গাড়ি পাঠিয়েছি। একদিন দেখলাম বৃষ্টিতে কাদায় মাখামাখি হয়ে ফিরছ।

আমি বললাম, থ্যাংক য়্যু।

আহসান সাহেব বললেন, আজও দেখি গা পুরোপুরি ভেজা। বাসায় যাও। ড্রেস চেঞ্জ করো।

আমি তার ঘর থেকে বের হলাম।

গাড়িতে আসার পরও এত ভিজলাম কীভাবে বলি। আহসান সাহেবের ঘরে ঢোকার আগে ছাদে গিয়ে পুরোপুরি ভিজেছি, যাতে কাপড় গায়ের সঙ্গে লেপ্টে যায়। অন্য পুরুষের সামনে এভাবে যাওয়া যায় না, তবে যাকে বিয়ে করব তার সামনে যাওয়া যায়। শুধু যে যাওয়া যায় তা না, যাওয়া উচিত। আহসান সাহেব। ফিরেও তাকালেন না, এটাই সমস্যা।

ধুর ছাতা! আমি আহসান সাহেব, আহসান সাহেব করছি কেন? এখন থেকে আহসান ডাকব। মনে মনে ডাকব। তাকে তো আর বলতে পারি না, আহসান, কী বই পড়ছ? আমি তোমার পাশে বসছি, তুমি আমাকে পড়ে শোনাও।

বিয়ের পরেও যে আমি তাকে আহসান বলতে পারব তা মনে হয় না। এই শুনছ! ধরনের কিছু ডাকতে হবে।

আমার মা বাবাকে ডাকে লিপির বাবা। শুনতে অসহ্য লাগে। দুই অক্ষরের নাম হয়ে সমস্যা হয়েছে। আমার নাম যদি মৃন্ময়ী হতো তাহলে মা কথায় কথায়। মৃন্ময়ীর বাবা ডাকতে পারত না।

আমি আমার নাম বদলাব। ডাক নাম ভালো নাম দুটাই। বই যখন ছাপা হবে তখন তো নাম বদলাতেই হবে। আমার ভালো নাম হামিদা বানু। কঠিন। প্রেমের উপন্যাসের লেখকের নাম হামিদা বানু, এটা কখনো হয়? আহসানের কাছে সুন্দর একটা ছদ্মনাম চাইতে হবে। আমি কয়েকটা নাম ঠিক করে রেখেছি। যেমন

১. মৃন্ময়ী চৌধুরী
২. রাজেশ্বরী
৩. চিত্রা সেন

কেউ কেউ বলতে পারে, হিন্দু নাম। আমি বলব, নামের আবার হিন্দু মুসলমান কী? নাম কি কখনো কলেমা পড়ে মুসলমান হয়েছে?

আহসানকে বিয়ে করলে বাবার একটা সমস্যা হবে। ছোট সমস্যা না, বেশ বড় সমস্যা। বাবা শুধু যে আহসানের বন্ধু তা না, বাবা তার কর্মচারী।

কাজের বিনিময়ে খাদ্যের মতো। আহসানের তিনতলা বাড়ির একতলার তিনটি রুমে বিনা ভাড়ায় বাবা থাকেন। বিনিময়ে ভাড়াটেদের সমস্যা দেখেন। বাথরুমের কল নষ্ট হয়ে গেলে মিস্ত্রি ডেকে দেন। ইলেকট্রিক লাইনের সমস্যা দেখেন। দুপুরের পর আহসানের এ্যারাম ইন্টারন্যাশনাল অফিসে বসেন। সেখান থেকে বেতন কত পান আমি জানি না, তবে খুব বেশি পান না। কারণ বেশ। টানাটানি করেই আমাদের সংসার চলে।

আহসানের অনেক টাকা। একবার যাদের অনেক টাকা হয়ে যায়, তাদের টাকা বাড়তেই থাকে। আহসানের টাকা শুধু বাড়ছে। সে টাকা খরচ করতে জানে না। আমি জানি। বিয়ের পর ধুমসে খরচ করব। টয়লেটেও এসি লাগাব। বারো ইঞ্চি কালার টিভি বসাব।

বছরে তিন মাস বাইরে বাইরে ঘুরব। প্রথমে যাব শ্রীলংকা। হুমায়ূন হাফমেড শ্রীলংকা ঘুরে এসে একটা বই লিখেছেন, নাম রাবণের দেশে। ওই বইটা পড়ে আমার শ্রীলংকা যাওয়ার ইচ্ছা হয়েছে।

.

বাসায় খিচুড়ি হাঁসের মাংস রান্না হচ্ছে। আর আমি আহসানের সঙ্গে দাবা নিয়ে বসেছি। আমার মাথায় একটা দুষ্ট বুদ্ধি এসেছে। আজ তাকে দ্রুত হারিয়ে দিলে কেমন হয়? পুচকি এক মেয়ের কাছে হার মানুষটা কীভাবে নেবে?

আমি মনে মনে চাল গুনছি। আঠার চালের মাথায় আমি ঘোড়ার চালে তাঁকে মাত করলাম। তিনি হতভম্ব হয়ে বললেন, মাত নাকি?

আমি বললাম, জানি না তো।

তিনি বললেন, রাজা নড়াবার জায়গা নেই।

আমি বললাম, তাই তো। কীভাবে হলো?

তিনি মুখ শুকনা করে বললেন, এসো আরেক দান খেলি।

আমি বললাম, না না, আর খেলব না। আপনি হেরে গেছেন। আমার খুব খারাপ লাগছে।

তিনি গম্ভীর গলায় বললেন, খেলায় হার-জিত থাকবেই। বোর্ড সাজাও। এবার তুমি সাদা নাও।

দ্বিতীয় দফায় তাঁকে হারালাম পনের চালে।

তিনি তৃতীয়বার বোর্ড সাজালেন। আমি দেখলাম তাঁর মুখ হয়েছে পাংশুবর্ণ। চাল দেওয়ার সময় তার হাত অল্প অল্প কাঁপছে। মানুষটার জন্যে এমন মায়া লাগল। চোখে পানি আসার মতো হলো।

তৃতীয় খেলায় তিনি একুশ চালে মাত হলেন। সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, তুমি দাবা খেলা ভালো জানো। এত দিন আমার সঙ্গে খেলা না-জানার অভিনয় করেছ। ঠিক বলেছি?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

অভিনয়টা কেন করলে?

একটা বাচ্চামেয়ের কাছে হার আপনি নিতে পারবেন না। এই ভেবে অভিনয় করেছি। আর করব না।

তিনি বললেন, কাঁদছ কেন?

আমি বললাম, আপনার জন্যে খুব খারাপ লাগছে, এইজন্যে কাঁদছি। আমি আপনার সঙ্গে আর কোনোদিনই দাবা খেলব না। আপনাকে আমার কাছে হারতে হবে না।

তুমি অদ্ভুত এক মেয়ে।

আমি অদ্ভুত না। আমি খুব খারাপ একটা মেয়ে।

তিনি টিস্যুর বাক্স এগিয়ে দিয়ে বললেন, চোখ মোছো। Compose yourself.

আমি উঠে দাঁড়ালাম। তিনি কিছু বলার আগেই দ্রুত ঘর ছেড়ে বের হলাম। দরজার চৌকাঠে মাথা লেগে কপালের এক কোনা আলুর মতো ফুলে উঠল। মা আমাকে দেখে বললেন, তোর কপালে কী হয়েছে?

আমি বললাম, আমাকে মেরেছে, এইজন্যে কপাল ফুলেছে।

মা অবাক হয়ে বললেন, কে মেরেছে?

আমি বললাম, আহসান সাহেব মেরেছেন। আমার কাছে দাবায় হেরে তিনি দাবার বাক্স ছুঁড়ে মেরেছেন।

মা বললেন, কী বলছিস তুই?

আমি বললাম, মা সত্যি। আল্লাহর কসম।

মা কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, তোদের ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারছি না। উনার মতো মানুষ দাবা বোর্ড ছুঁড়ে মারবেন। এইসব কী?

আমি ঠিক করেছি উনার মাথায় একটা ডিকশনারি ছুঁড়ে মারব। উনি জ্ঞানী মানুষ তো, উনার জন্যে ডিকশনারি।

মা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন। তার চোখ থেকে বিস্ময়বোধ দূর হচ্ছে না।

.

দুপুরে খেতে বসার ঠিক আগে আগে প্রতিমা উপস্থিত। আমি বললাম, প্রতিমা, তুই ভালো দিনে এসেছিস। আজ বাসায় হাঁস আর খিচুড়ি হচ্ছে।

খাবার টেবিলে বাইরের লোক থাকলে বাবা খুব খুশি হন। কেন খুশি হন তা জানি না। আমরা গরিব মানুষ। কেউ আমাদের খাবারে ভাগ বসালে আমাদের খুশি হওয়ার কথা না।

বাবা প্রতিমার দিকে তাকিয়ে বললেন, হাঁসের মাংসের কোন পিস তোমার পছন্দ বলো।

প্রতিমা বলল, কাকা, আপনার কোন পিস পছন্দ সেটা বলুন।

বাবা বললেন, রানের মাংস।

প্রতিমা বলল, তাহলে আমি নেব দুটা রান। আপনাকে রান খেতে দেব না।

এমন কিছু হাসির কথা না, কিন্তু বাবা হাসতে হাসতে ভেঙে পড়ে যাচ্ছেন।

প্রতিমা সত্যি সত্যি দুটা রান পাতে নিল। বাবার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, কাকা, আমি হাঁসের মাংস খাই না। আমার প্লেটটা আমি আপনার জন্যে সাজিয়েছি। আমি খিচুড়ি খাব ঝোল দিয়ে।

বাবা আবারও হাসতে হাসতে ভেঙে পড়লেন। তাকে দেখে মনে হচ্ছে সকালে মানিব্যাগ এবং হাঁস হারানোর দুঃখ তিনি পুরোপুরি ভুলে গেছেন।

.

প্রতিমাকে আমি উপন্যাসের প্রথম পাতাটা পড়ালাম। সে বিরক্ত হয়ে বলল, শুরুটা আমার করার কথা না? একটা সেক্স-সিকোয়েন্স দিয়ে শুরু। আমি সব গুছিয়ে রেখেছি। খুব রাগ করলাম। তোর সঙ্গে আর কথা বলব না। অংক মিসকে সেকেন্ড চিঠি যা পাঠাব, তাও পড়তে দিব না।

আমি বললাম, চিঠি সঙ্গে এনেছিস?

প্রতিমা বলল, হু। চিঠি পড়াতেই তো এসেছি।

তাহলে দে, পড়ি।

তুই যদি প্রমিজ করিস উপন্যাসের শুরুটা আমাকে লিখতে দিবি, তাহলে পড়তে দেব।

আচ্ছা যা, তোকে লিখতে দেব।

প্রতিমা চিঠি বের করল। দ্বিতীয় চিঠি প্রথমটার চেয়েও ভয়ংকর

ও আমার লুতু লুতু পুতুপুতু গুতু গুতু সোনা। তুমি কেমন আছ লক্ষ্মী? তুমি আমার পক্ষী।

আচ্ছা পুতু পুতু গুতু গুতু, শোনো। তুমি তোমার পাছাটা এত বড় কীভাবে বানিয়েছ? নিশ্চয়ই বিশেষ কোনো এক্সারসাইজ করো।

আমার কথায় আবার রাগ করছ না তো? তুমি রাগ করলে আমি কিন্তু মরেই যাব।

.

প্রতিমা সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকল, আমার উপন্যাসের শুরুটা লিখে দিয়ে গেল। ভয়ংকর এক শুরু।

নগ্ন নায়িকার ঘরে ঢুকেছে ইমন (শুভ্র নাম বদলে ইমন রাখা হয়েছে)। ইমন চট করে দরজা লক করে দিল, কিন্তু বারান্দার জানালাটা রইল খোলা। খোলা জানালা দিয়ে শুধু যে দাঁড়কাক সব দেখছে তা না, শব্দ শুনে একসময় মা এসে জানালা দিয়ে দেখেন তার মেয়ে এবং ইমন আছে 69 অবস্থায়।

আমি প্রতিমাকে বললাম, 69 কী?

প্রতিম হাই তুলতে তুলতে বলল, তোর বোঝার দরকার নেই। যাদের বোঝার তারা ঠিকই বুঝবে।

প্রতিমা চলে যাওয়ার পরে আমি পুরো লেখাটা কপি করে আহসান সাহেবের কাছে গেলাম। আজ তাঁর মেজাজ খুবই ভালো। তিনি আমাকে দেখেই হাসিমুখে বললেন, Hello friend!

আমি হাসলাম। অন্য রকম হাসি। ঠোঁটের এক কোনায় হাসতে হয়।

আহসান সাহেব বললেন, হাতে কাগজ কিসের? উপন্যাস?

জি। শুরুটা লিখে ফেলেছি।

কেমন হয়েছে?

বুঝতে পারছি না, এইজন্যে আপনার কাছে নিয়ে এসেছি। পড়ে দেখুন।

আহসান সাহেব পড়ছেন। আমি তার সামনে বেতের চেয়ারে ভাজা মাছ উল্টে খেতে পারি না টাইপ মুখ করে বসে আছি। মাঝে মাঝে ঠোঁট গোল করে শিস দেওয়ার চেষ্টা করছি। শিস হচ্ছে না। প্রতিমা খুব সুন্দর শিস দিতে পারে। তার কাছে থেকে শিখতে হবে।

লিপি।

জি।

আহসান সাহেব হাতের লেখা টেবিলে রাখতে রাখতে বললেন, তুমি মানসিকভাবে অসুস্থ এক কিশোরী। তোমার চিকিৎসা হওয়া প্রয়োজন।

কী চিকিৎসা?

সাইকিয়াট্রিস্ট ঠিক করবেন কী চিকিৎসা। আমার পরিচিত সাইটেকিয়াট্রিস্ট আছেন। আমি তোমাকে সঙ্গে করে তার কাছে নিয়ে যাব। ঠিক আছে?

হ্যাঁ, ঠিক আছে। কবে নিয়ে যাবেন?

এখনই নিয়ে যেতে পারি। সে রাত নটা পর্যন্ত রোগী দেখে। এখন সময় হলো সাড়ে সাত। টেলিফোন করে দেখি সে আছে কি না।

টেলিফোনে সাইকিয়াট্রিস্টকে পাওয়া গেল।

আহসান সাহেব অ্যাপয়েন্টমেন্ট করলেন। আমাকে বললেন, তুমি ড্রেস পাল্টালে পাল্টাও। মাকে বলে আসো।

কী বলব? পাগল হয়ে গেছি তো, তাই সাইকিয়াট্রিস্ট দেখাচ্ছি?

এইসব বলার দরকার নেই। বলো যে আমার সঙ্গে শপিংয়ে যাচ্ছ। এক ঘণ্টার মধ্যেই ফিরবে।

আমি ড্রেস বদলে শাড়ি পরলাম। চোখে কাজল দিলাম।

মা অবাক হয়ে বললেন, ব্যাপার কী রে?

আমি বললাম, ব্যাপার জানি না। আহসান সাহেব আমাকে তার সঙ্গে যেতে বললেন। আচ্ছা মা শোনো, উনি যদি আমাকে কোনো হোটেলে নিয়ে যেতে চান তাহলে কী করব?

মা আতংকে অস্থির হয়ে বললেন, হোটেলে কেন নিয়ে যাবে?

আমি গালে পাউডার ঘষতে ঘষতে বললাম, বুড়োরা তরুণী মেয়েদের হোটেলে কেন নিতে চায় তুমি জানো না?

তোর বাবা বাসায় নেই। তাঁকে না জানিয়ে আমি তোকে আহসান সাহেবের সঙ্গে ছাড়ব না।

আমি বললাম, এই কথা আমি উনাকে বলতে পারব না। তুমি বলে আসো। তুমিও পারবে না। আশ্রিতদের এই হলো সমস্যা।

মা ক্ষীণ গলায় বললেন, আমরা আশ্রিত?

আমি বললাম, অবশ্যই।

.

সাইকিয়াট্রিস্ট সাহেবকে দেখে আমার ভালো লাগল। পঞ্চাশের মতো বয়স। মাথাভর্তি সাদা-কালো মেশানো চুল। নাকের নিচে আলবার্ট আইনস্টাইনের মতো গোঁফ। ভারী কাঁচের চশমার আড়ালে বড় বড় চোখ। তিনি পরেছেন সিল্কের হাফ হাওয়াই শার্ট। হুমায়ূন স্যারের মিসির আলির চেহারা হয়তো এই দ্রলোকের মতো। সাইকিয়াট্রিস্টের নাম আশফাঁক। মনোবিদ্যায় তাঁর Ph.D ডিগ্রি আছে।

তাঁর সঙ্গে আমার কথোপকথন (কথোপকথনের সময় আহসান সাহেবকে বাইরে রাখা হলো)।

সাইকিয়াট্রিস্ট : মা। কেমন আছ?

আমি : (শুরুতেই মা ডাকায় আমি বেশ চমকেছি। ভেবে রেখেছিলাম উল্টা পাল্টা কথা বলে সাইকিয়াট্রিস্টকে ভড়কে দেব। এখন মনে হচ্ছে পারব না। যে শুরুতেই মিষ্টি করে মা ডাকে, তার সঙ্গে উল্টা-পাল্টা কথা বলা যায় না।)।

সাইকিয়াট্রিস্ট : প্রশ্নের জবাব দিচ্ছ না কেন? তুমি কেমন আছ?

আমি : চাচা। আমি ভালো আছি।

সাইকিয়াট্রিস্ট : কতটা ভালো? খুব বেশি, না মোটামুটি ভালো?

আমি : মোটামুটি।

সাইকিয়াট্রিস্ট : তোমার উপন্যাসের প্রথম তিন পাতা আমি পড়েছি। মা, বলো তো তোমার জীবনে কি এই ধরনের কোনো ঘটনা ঘটেছে?

আমি : না।

সাইকিয়াট্রিস্ট : তোমার মধ্যে কি কোনো পাপবোধ আছে?

আমি : না।

সাইকিয়াট্রিস্ট : কারও প্রতি কি তোমার রাগ আছে? প্রচণ্ড রাগ। খুন করতে। ইচ্ছা হয়, এমন?

আমি : আছে। আমার বড় মামার প্রতি আছে।

সাইকিয়াট্রিস্ট : তার প্রতি রাগের কারণটা বলো তো শুনি।

আমি : বলব না। আপনি অন্য প্রশ্ন করুন।

সাইকিয়াট্রিস্ট : মা শোনো। আমি তোমার ডাক্তার। ডাক্তারকে সব বলতে হয়।

আমি : যখন ছোট ছিলাম, আট ন বছর বয়স, তখন মামা খেলার ছলে আমার শরীরের নানান জায়গায় হাত দিতেন। খুবই অস্বস্তি বোধ করতাম। মামা কেন এরকম করছেন বুঝতাম না। এখন বুঝি।

সাইকিয়াট্রিস্ট : তুমি যে অসম্ভব রূপবতী একজন মেয়ে, এটা কি জানো?

আমি : জানি। মা আমাকে আদর করে পরী ডাকেন। তা ছাড়া নিজেও আয়নায় নিজেকে দেখি।

সাইকিয়াট্রিস্ট : দেখে মুগ্ধ হও?

আমি : হই।

সাইকিয়াট্রিস্ট : তোমার বান্ধবীর সংখ্যা কেমন?

আমি : আমার একজন মাত্র বান্ধবী, তার নাম প্রতিমা।

সাইকিয়াট্রিস্ট : সে কি দেখতে কদাকার?

আমি : না। অপূর্ব রূপবতী।

সাইকিয়াট্রিস্ট : তোমার চেয়েও?

আমি : মনে হয় সমান সমান। আপনাকে একটা কথা বলি, আমার উপন্যাসের প্রথম তিন পাতা আমার লেখা না। প্রতিমার লেখা।

সাইকিয়াট্রিস্ট; অতিরিক্ত রূপবতীরা রূপের কারণে সবার চেয়ে আলাদা হয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে Alienation প্রক্রিয়া শুরু হয়। তখনই মানসিক সমস্যা দেখা দেয়।

আমি : আমার মধ্যে কোনো মানসিক সমস্যা নেই। আমার বান্ধবী প্রতিমার মধ্যে আছে। আমি কি তাকে নিয়ে আপনার কাছে আসতে পারি?

সাইকিয়াট্রিস্ট : পারো।

বাসায় ফিরলাম রাত সাড়ে নটায়। বাবা তখনো ফিরেন নি। মা এবং বড় মামা বসে আছেন। দুজনের চোখ-মুখ শক্ত হয়ে গেছে। বড় মামা বললেন, লিপি, কোথায় গিয়েছিলে?

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, আহসান সাহেবের সঙ্গে লং ড্রাইভে গিয়েছিলাম।

বড় মামা বললেন, তুমি বসো এখানে। তোমার সঙ্গে কথা আছে।

আমি বললাম, এক মিনিট মামা। আসছি। বলেই নিজের ঘরে ঢুকে দরজা লাগিয়ে বাতি অফ করে দিলাম।

৩. সোমবার আমার জন্যে অশুভ

সোমবার আমার জন্যে অশুভ। শুধু অশুভ বললে কম বলা হবে, ভয়ংকর ভয়ংকর অশুভ। এমন কোনো সোমবার যায় নি যেদিন আমার জীবনে খারাপ কিছু ঘটে নি।

আজ যে সোমবার মনেই ছিল না। মা যখন বললেন, লিপি, তোর ঘরটা ছেড়ে দিতে হবে। তখনই মনে হলো, আজ সোমবার না তো! মাকে বললাম, আজ কি সোমবার?

মা বললেন, সোমবার মঙ্গলবার জানি না। তুই ঘরের জিনিসপত্র বের করে ফেল।

আমি গলা স্বাভাবিক করে বললাম, কেন?

মা আনন্দিত গলায় বললেন, তোর বড় মামা এই ঘরে থাকবে।

তাঁর না হোটেলে ওঠার কথা?

নিজের বোনের বাড়ি থাকতে সে হোটেলে কেন উঠবে?

বড় মামার আমাদের বাসায় এসে ওঠার কারণটা বলি। রামপুরায় তাঁর বাড়ি আছে। পাঁচ কাঠা জমির ওপর বাড়ি। অনেক দিন থেকেই ডেভেলপারের সঙ্গে বড় মামা দেনদরবার করছিলেন। তারা পুরনো বাড়ি ভেঙে দশতলা বাড়ি করবে। তারা কিছু নেবে, বড় মামা কিছু পাবেন। ডেভেলপারদের সঙ্গে দরে বনছিল না। এখন মনে হয় বনেছে।

আমি বললাম, আমি কোথায় থাকব?

তুই পুবের ঘরে থাকবি।

পুবের ঘরটা তো স্টোররুম।

জিনিসপত্র সরিয়ে ফেললেই সুন্দর ঘর হবে। আমি গুছিয়ে দেব। জানালায় নতুন পর্দা দেব।

মার আনন্দে ঝলমল মুখ দেখে আমি নিজের কষ্ট ভুলে গিয়ে এমন ভাব করতে থাকলাম যেন বড় মামা আসায় আমিও খুশি। আনন্দ রাখার জায়গা পাচ্ছি না। এমন অবস্থা।

এখন মার খুশির কারণ ব্যাখ্যা করি। ডেভেলপাররা যে ফ্ল্যাটবাড়ি করবে মা সেখান থেকে ওয়ারিশান সূত্রে ফ্ল্যাট পাবে। আমার দুই মামা। ছোট মামা কলেজে পড়ার সময় কক্সবাজারে বেড়াতে গিয়ে সমুদ্রে ডুবে মারা গেছেন। এখন বড় মামা। ও মা এই দুজনই শুধু নানাজানের সম্পত্তির মালিক।

বড় মামার দুই ছেলে এবং এরা দুজনই অস্ট্রেলিয়ায়। ইন্ডিয়ান কী এক রেস্টুরেন্টে কাজ করে। মামিও ছেলেদের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ায় থাকেন। মামা-মামির সম্পর্ক ভয়ানক খারাপ।

আমি, মা আর সকিনা মিলে বিকেলের মধ্যে মামার ঘর গুছিয়ে ফেললাম। বাবা নিজেই প্লাস্টিক পেইন্ট করলেন। এইসব কাজ তিনি ভালো পারেন।

বড় মামা সন্ধ্যাবেলায় একটি এসি নিয়ে উপস্থিত হলেন। যে ঘরে তিনি থাকবেন সেখানে এসি বসবে। তিনি গরম সহ্য করতে পারেন না। এসির সঙ্গে মিস্ত্রি এসেছে। সে এক ঘণ্টার মধ্যে এসি বসিয়ে দিল।

আমার পরিচিত ঘরটা চোখের সামনে অন্যরকম হয়ে গেছে। ঘরের দেওয়াল হালকা নীল। এই গরমেও ঘর শীতকালের মতো ঠান্ডা। বিছানায় নতুন চাঁদর। একটা কোলবালিশও কেনা হয়েছে। খাটের পাশে বেডসাইড কার্পেট দেওয়া হয়েছে। নতুন দেয়ালঘড়ি লাগানো হয়েছে।

বড় মামা তার ঘর দেখে সন্তোষ প্রকাশ করলেন। মাকে বললেন, সব ঠিক আছে। আজ আর উঠব না। ঘরে কাঁচা রঙের গন্ধ। গন্ধটা মরুক। নতুন একটা ফ্ল্যাট স্ক্রিন টিভি কিনব। আগেরটা নষ্ট হয়ে গেছে। ছবি ওঠানামা করে।

মা বলল, ভাইজান, আর কী কী লাগবে বলুন, আমি ব্যবস্থা করব।

বড় মামা বললেন, তোকে কিছুই ব্যবস্থা করতে হবে না। ব্যবস্থা যা করবার আমিই করব। এখন আমার কিছু কথা মন দিয়ে শোন, সকালে আমি চার-পাঁচটা পত্রিকা পড়ি। পত্রিকার নাম দিয়ে যাব, হকারকে পত্রিকা দিতে বলবি। পত্রিকার বিল আমি দেব।

মা বললেন, আপনি কেন দেবেন?

বড় মামা বললেন, তোদের অবস্থা আমি জানি, এইজন্যে আমি দিব। শুধু পত্রিকার বিল না, মাসে এক হাজার করে টাকা দিব। মাসের এক তারিখে সারা মাসের চাল ডাল তেল মসলা কিনে দেব।

বাবা বললেন, ভাইজান, এইসব কী বলেন?

পেইংগেস্টরা যে রকম থাকে আমি সেই রকম থাকব। এই বিষয়ে আর কোনো কথা শুনব না।

বড় মামা পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করলেন। সেখান থেকে এক হাজার টাকার দুইটা চকচকে নোট বের করে বাবার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, ঘর ঠিক করেছ, খরচপাতি হয়েছে, এই টাকাটা রাখো।

মা বাবার দিকে তাকিয়ে চোখে ইশারা করলেন টাকা না রাখতে, বাবা টাকা রাখলেন। এমন ভাব করলেন যেন চোখের ইশারা বুঝতে পারেন নি।

বড় মামা চলে যাওয়ার পর বাবা আমাকে নিয়ে বারান্দায় গেলেন, গলা নামিয়ে বললেন, ডেভেলপারের সঙ্গে তোমার মামার কী চুক্তি হয়েছে সেটা জানা দরকার। ডেভেলপাররা চুক্তির সময় ক্যাশ টাকা দেয়। সেই টাকায় তোমার মার অংশ আছে। সেই টাকা কোথায়?

আমি বললাম, এইসব আমাকে কেন বলছ? আমার সঙ্গে তো ডেভেলপারদের কোনো চুক্তি হয় নি।

বাবা বললেন, তোমার সঙ্গে শেয়ার করছি। তুমি আবার তোমার মাকে কিছু বলতে যেয়ো না। তোমার মা ভাববে আমি লোভী।

আমি বললাম, তুমি তো লোভীই। লোভী না হলে এমন চিন্তা করতে না।

বাবা বললেন, বাস্তব চিন্তা করছি। তোমার বড় মামা ধুরন্দর প্রকৃতির মানুষ। শেষে দেখা গেল তোমার মা কিছুই পেল না।

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, কিছু না পেলে কী আর করা!

আমার এই হাই নকল। আমি ইচ্ছা করলেই ঘনঘন হাই তুলতে পারি। কোনো আলাপ পছন্দ না হলে আমি হাই তুলি।

বাবা যে বললেন, বড় মামা ধুরন্দর প্রকৃতির, এটা ঠিক আছে। একটা ঘটনা বললেই তার প্রকৃতি বোঝা যাবে। আমার নানিজানের প্রচুর গয়না ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর বড় মামা আমার মাকে বললেন, মৃত্যুর সময় মানুষের স্বাভাবিক চিন্তা নষ্ট হয়ে যায়। অস্বাভাবিক কাজকর্ম করে।

মা বললেন, এই কথা কেন বলছ ভাইজান?

বড় মামা বললেন, মার কর্মকাণ্ড দেখে বাধ্য হয়ে বলছি।

মা কী করেছে?

বড় মামা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, যেদিন মারা গেলেন সেদিন সকালে তোর ভাবিকে ডেকে বললেন, "বৌমা, আমার সব গয়না তোমাকে দিয়ে গেলাম। তুমি দিয়ো তোমার ছেলের বৌকে।

তোকে মা এত আদর করত, অথচ তোর কথা একবার মনেও করল না। আশ্চর্য মহিলা!

মা বলল, মাকে নিয়ে খারাপ কিছু বলবে না ভাইজান। মা যা ভালো মনে করেছে করেছে।

বড় মামা বললেন, কাজটা যে অনুচিত হয়েছে সেটা বলব না? যাই হোক, আমি তোর ভাবিকে বলেছি, কিছু গয়না ফরিদাকে দিয়ো। মায়ের স্মৃতিচিহ্ন। তবে মেয়েমানুষ তো, গয়না হাতছাড়া করবে না।

এই হলো আমার বড় মামা। আমার ধারণা বড় মামা একদিন বলবে, ফরিদা! তোকে বলা হয় নাই, রামপুরার জমিটা বাবা আমাকে লিখে দিয়ে গেছেন। কাজেই তোর সেখানে অংশ নাই। তারপরেও তোকে একটা ফ্ল্যাট আমি দেব।

যদি এরকম কিছু ঘটে, তাহলে আমি বড় মামাকে টাইট দেব। কীভাবে টাইট দেব তা এখনো ঠিক করি নি।

সন্ধ্যাবেলা আহসানের ঘরে গেলাম।

আহসান আহসান বলতে অস্বস্তি লাগছে, আমি আহসান সাহেবে ফিরে যাই। উনার ঘরে কোনো অজুহাত ছাড়া যাওয়া ঠিক না, আমি এক কাপ চা নিয়ে গেলাম।

আহসান সাহেব বললেন, আমি দিনে দুই কাপের বেশি চা খাই না। আজকের দিনের দুকাপ চা খাওয়া হয়ে গেছে।

আমি বললাম, এটা সাধারণ চা না। এটা তুলসি চা। চা পাতার সঙ্গে তুলসি পাতা জ্বাল দিয়ে বানানো। (কথাটা মিথ্যা, সাধারণ চার মধ্যে আমি ধনিয়া পাতা দিয়েছি। ধনিয়া চা বলা যেতে পারে।)

আহসান সাহেব বললেন, তুলসি চা তো আমি আরও খাই না। তুমি খেয়ে ফেলো।

আমি আচ্ছা বলে চায়ে চুমুক দিলাম। উনি বললেন, তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে কোনো কাজে এসেছ। কাজটা বলো।

আমি বললাম, আপনার মোবাইল থেকে কি একটা টেলিফোন করতে পারব? (আমার কোথাও টেলিফোন করার দরকার নেই। উনার মোবাইল কিছুক্ষণের জন্য প্রয়োজন। আসমা নামের একটা মেয়ে প্রায়ই তাকে টেলিফোন করে। উনিও করেন। আমার ওই মহিলার টেলিফোন নম্বর প্রয়োজন।)

আহসান সাহেব বললেন, মোবাইল ফোন হলো ব্যক্তিগত ফোন। এটা দেওয়া যাবে না। ল্যান্ডফোনে টেলিফোন করো।

আমি বললাম, জি আচ্ছা।

উনি বললেন, আমার কথা শুনে মুখ ভোঁতা করে ফেললে কেন?

আমি বললাম, আপনার কথা শুনে মুখ ভোঁতা করি নি। অন্য কারণে মুখ ভোঁতা হয়েছে।

অন্য কারণটা কী?

উপন্যাসটা লিখতে পারছি না। গল্পটা গোছানো আছে, কিন্তু লেখা আসছে না।

গল্পটা কী?

প্রেমের গল্প। বয়স্ক একজন মানুষ খুবই অল্প বয়সী একটা মেয়ের প্রেমে পড়ে। বুড়োটা নানান কর্মকাণ্ড করে মেয়েটাকে তার প্রেমের ব্যাপার বোঝাতে চায়, কিন্তু বোঝাতে পারে না।

কী রকম কর্মকাণ্ড?

এটা নিয়ে এখনো চিন্তা করি নি। আচ্ছা যাই।

টেলিফোন না করেই চলে যাচ্ছ?

ও আল্লাহ! ভুলে গেছি।

আমি ল্যান্ডফোন হাতে নিয়ে বসে আছি। কাকে টেলিফোন করব বুঝতে পারছি না। কাছের কারও টেলিফোন নম্বর আমার মনে নেই। আমি কিছুক্ষণ এলোমেলোভাবে নম্বর টিপে কারও সঙ্গে কথা বলছি এমন গলায় বললাম, মৃন্ময়ী! আমি লিপি। দুপুরে তোর ওখানে যাওয়ার কথা ছিল, যেতে পারি নি, সরি। আমার বড় মামা আমাদের বাসায় থাকতে

আসছেন। তার জন্য ঘর গুছাচ্ছিলাম। উনি থাকবেন আমার ঘরে। আমি কোথায় থাকব? এখনো ঠিক করি নি। আমাদের একটা স্টোররুমের মতো আছে, সেখানে থাকতে পারি। আচ্ছা রাখি, কাল দেখা হবে।

ফোন রেখে চলে আসছি, আহসান সাহেব বললেন, তোমাদের ফ্ল্যাটের দুইটা ঘর আমার অফিসের জিনিসপত্র দিয়ে বোঝাই, তার একটা খালি করে দিতে বলি, তুমি সেখানে থাকো।

আমি বললাম, না।

তিনি বললেন, না কেন?

আমি একজন লেখিকা, এইজন্য না। ক্রিয়েটিভ মানুষ কারও দয়া নেয় না।

আহসান সাহেব শব্দ করে হাসলেন। আমি বললাম, এইভাবে হাসছেন কেন?

উনি বললেন, তুমি স্টোররুমে থাকবে, এটা আমাকে শোনাবার জন্য মিছিমিছি টেলিফোনে কথা বলেছ। ল্যান্ডফোনে সাতবার বোতাম টিপেছ।

তোমার কথা শুনে যখন ঘরের ব্যবস্থা করতে চাচ্ছি, তখন আবার লেখিকা সাজছ, এইজন্য হাসছি।

আমি মুখ ভোঁতা করে বের হয়ে এলাম। আজ সোমবার বলেই যথেষ্ট লজ্জা। পেয়েছি। তবে লজ্জার সঙ্গে কিছুটা আনন্দও পেয়েছি। উনি আমাকে যথেষ্ট মন দিয়ে লক্ষ করেছেন,

তা না হলে আমি যে সাতবার বোতাম টিপেছি তা ধরতে পারতেন না। আনন্দ পাওয়ার মতো ঘটনা ঘটছে। হয়তো আরও ঘটবে।

.

আহসান সাহেবের লোকজন একদিনে আমার ঘর ঠিক করে দিল। ঘরে নতুন রঙ করা হলো। এসি লাগানো হলো। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, নতুন একটা বাইশ ইঞ্চি ফ্ল্যাট স্ক্রিন টিভি চলে এল। মা অবাক হয়ে বলল, লিপি, ব্যাপার কী রে?

আমি বললাম, জানি না কী ব্যাপার। মনে হয় উনি আমার প্রেমে পড়েছেন। বুড়োরা প্রেমে পড়লে প্রেমিকার মন ভুলাবার জন্যে প্রচুর খরচপাতি করে।

মা আঁতকে উঠে বললেন, ছিঃ ছিঃ কী বলিস তুই! তওবা কর। ফেরেশতার মতো মানুষ। তোকে নিজের মেয়ের মতো দেখেন। তাকে নিয়ে এত নোংরা কথা। উনার কানে গেলে উনি কী ভাববেন?

রাত আটটার দিকে বাবা বাসায় এলেন। মা সঙ্গে সঙ্গে তার কাছে নালিশ করলেন। বাবা বললেন, লিপি! তুই এই ধরনের কথা বলেছিস? ইয়েস অর নো? (বাবা সবসময় আমার সঙ্গে তুমি তুমি করে কথা বলেন। এখন তুই-এ নেমে এসেছেন।)

আমি বললাম, বলেছি।

বাবা বললেন, কানে ধর।

আমি বললাম, কানে ধরব না।

বাবা বললেন, এত বড় কথা তুই কোন সাহসে বললি?

আমি বললাম, ইচ্ছা হয়েছে বলেছি।

আর কখনো বলবি?

আবার যদি ইচ্ছা হয় বলব।

তোর মতো দুষ্ট মেয়ে তো আমি বাসায় রাখব না। দুষ্ট মেয়ের চেয়ে শূন্য বাড়ি ভালো। তুই এক্ষণ, এই মুহূর্তে আমার বাসা ছেড়ে চলে যাবি।

আমি বললাম, Ok.

বাবা চিৎকার করে বললেন, আবার ইংরেজি বলে? গেট আউট, গেট আউট।

মা বললেন, এত রাতে কোথায় যাবে?

বাবা বললেন, সেটা আমার বিবেচ্য না। যেখানে ইচ্ছা যাবে। দুষ্ট মেয়ে আমি পুষব না। আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা। আমি আদর্শ নিয়ে চলি।

আমি গটগট করে তাদের সামনে থেকে বের হলাম। আহসান সাহেবের ড্রাইভার কিসমতকে বললাম, আমাকে একটা জায়গায় নিয়ে যান, আপনার স্যার। বলেছে।

গাড়ি নিয়ে আমি কোথায় গেলাম শুনলে অবাক হবেন, আমি গেলাম লেখক হুমায়ূন আহমেদের ধানমণ্ডির ফ্ল্যাটে।

দারোয়ান গেটেই আটকাল। আমি বললাম, হুমায়ূন আহমেদ আমার বড় চাচা। শুনেছি উনার শরীর খারাপ, এইজন্যে দেখতে এসেছি।

দারোয়ান বলল, স্যার তো বাসায় নেই। ম্যাডামকে নিয়ে কোথায় যেন গেছেন।

আমি বললাম, অসুস্থ শরীর নিয়ে চাচা কোথায় গেলেন? লেখক মানুষ, শরীর নিয়ে তাদের কারবার না, মন নিয়ে তাদের কারবার। যাই হোক, আমি অপেক্ষা করব।

দারোয়ান দামি গাড়ি দেখেই মনে হয় ছেড়ে দিল। আমি কিসমত ভাইকে বললাম, আমার বাবা-মা আমাকে বাসা থেকে বের করে দিয়েছেন। আমি এখন আপনাকে ছেড়ে দিচ্ছি। আমি আপনার পায়ে পড়ি, আপনি আমাকে কোথায় নামিয়ে দিয়েছেন বলবেন না। বলবেন, আমাকে রেলস্টেশনে নামিয়ে দিয়েছেন। আমি চাই তাঁরা দুশ্চিন্তা করুক।

লেখক এবং লেখকপত্নী রাত এগারটার দিকে এলেন। এর মধ্যে আমি বেশ স্বাভাবিকভাবেই আছি। এই বাড়িতে টেলিফোন করলে যে বলত, "স্যার রেস্টে আছেন, তার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। তার বাড়ি চাঁপাইনবাবগঞ্জ, সে হুমায়ুন আহমেদের পিয়ন, নাম মোস্তফা।

আমি বললাম, মোস্তফা ভাই, ভাত খাব। ঘরে তেমন কোনো খাবার না করলে ডিম ভেজে দিতে বলুন। গরম ভাত, ডিম ভাজা আর শুকনা মরিচ ভাজা। হুমায়ূন স্যারের পছন্দের খাবার। আমি তাঁর লেখায় পড়েছি।

মোস্তফা ভাই ডিম ভাজতে গেল। এই ফাঁকে আমি একটা ঘরে ঢুকে পড়লাম। দেখি, লেখকের পুত্র গম্ভীর হয়ে টিভিতে কার্টুন দেখছে। আমি বললাম, তোমার নাম কী? সে বলল, আমাকে বিরাক্ত করবে না।

আমি বললাম, বিরাক্ত আবার কী?

সে বলল, বিরাক্ত হলো ডিস্টার্ব।

তোমার নামটা জানতে পারি?

নিষাদ।

নামের অর্থ জানো?

আমাকে বিরাক্ত করবে না। আমাকে বিরাক্ত করলে আমি লাগ হব। আমার অনেক লাগ।

ছেলেটা র এর জায়গায় ল বলছে, আবার বিরক্ত বলার সময় র উচ্চারণ করতে পারছে। তার সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ গল্প করার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সে হাত ধরে আমাকে তার ঘরের বাইরে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

.

লেখক এবং লেখকপত্নী ফিরলেন রাত এগারটায়।

আমি আয়োজন করে ভাত খাচ্ছি, লেখকপত্নী আমাকে দেখে আঁতকে উঠে বললেন, তুমি কে?

আমি বললাম, আমার নাম মৃন্ময়ী।

লেখকপত্নী বললেন, আমি তো তোমাকে চিনতে পারছি না। তিনি লেখকের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি একে চেনো?

লেখক বললেন, না। বলেই তিনি শোবার ঘরে ঢুকে গেলেন। তাঁর মুখ গম্ভীর। মনে হয় স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে।

লেখকপত্নী বললেন, এই বাড়িতে এসেছ কেন? এখানে কী?

আমি বললাম, আমাকে বাবা বাসা থেকে বের করে দিয়েছেন। আমার কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। রাতটা আপনাদের বাসায় থাকব, ভোরবেলা চলে যাব।

লেখকপত্নী বললেন, কোথায় যাবে?

আমি বললাম, এখনো ঠিক করি নি, নাক বরাবর হাঁটা ধরব।

লেখকপত্নী (তাঁর নাম শাওন) শান্ত গলায় বললেন, তুমি খেতে বসেছ, খাও তারপর আমি নিজে তোমাকে তোমার বাসায় দিয়ে আসব। তোমার বাবার সঙ্গে কথা বলব।

আমি বললাম, আচ্ছা।

আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, এই মহিলা আমাকে শুধু ডিমভাজা আর ডাল দিয়ে খাবার কেন দেওয়া হয়েছে তা নিয়ে মোস্তফাঁকে ধমক দিলেন। ফ্রিজ থেকে মাং বের করে মাইক্রোওয়েভে গরম করে দিতে বললেন।

এক পর্যায়ে লেখক আমার পাশের চেয়ারে খেতে বসলেন। তাকে দেওয়া হলো পাতলা খিচুড়ি। তিনি এক বন্ধুর বাসায় বেড়াতে গিয়েছিলেন। এত রাতে না খাইয়ে তাঁকে কেন ছেড়ে দিল ভেবে আমার লেখকপুত্রের মতো লাগ হয়ে গেল।

আমি ভেবেছিলাম লেখক সাহেব আমার সঙ্গে কোনো কথা বলবেন না। পাতলা খিচুড়ি খেয়ে চলে যাবেন। তিনি তা করলেন না। আমার দিকে না তাকিয়ে বললেন, তুমি বলছিলে তোমার নাম মৃন্ময়ী। এটা তোমার আসল নাম না। আসল নাম কী?

আমি বললাম, আসল নাম না তা কীভাবে বুঝলেন?

মৃন্ময়ী শব্দটা যেভাবে উচ্চারণ করেছ সেখান থেকে বুঝেছি।

আমার নাম লিপি।

এইবার তিনি সরাসরি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বললেন, কেমন আছ লিপি?

আমি বললাম, ভালো আছি।

কতটা ভালো?

অনেকখানি ভালো।

একটা উপদেশ কি তোমাকে দিতে পারি?

অবশ্যই পারেন।

এই মুহূর্তে তোমাকে নিয়ে তোমার বাবা কতটা দুশ্চিন্তা করছেন বুঝতে পারছ?

পারছি।

না, পারছ না। এখন যদি তুমি বাসায় উপস্থিত হও, তোমাকে দেখে তোমার বাবা আনন্দে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবেন। খাওয়া শেষ করে গাড়িতে উঠো, শাওন তোমাকে বাসায় দিয়ে আসবে।

জি আচ্ছা।

রাত একটায় শাওন ম্যাডাম মোস্তফাঁকে নিয়ে আমাকে পৌঁছে দিলেন। বাবার সঙ্গে তার কোনো কথা হলো না, কারণ বাবা আমাকে দেখেই মাগো কোথায় ছিলি বলে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। সবাই তাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

আহসান সাহেব আমাকে তার ঘরে ডেকে নিয়ে গেলেন। তাঁর মুখ ভয়ংকর গম্ভীর।

আহসান সাহেব বললেন, তুমি যে কত বড় অন্যায় করেছ তা কি বুঝতে পারছ?

আমি বললাম, আমি কোনো অন্যায় করি নি। বাবা আমাকে বাসা থেকে বের হয়ে যেতে বলেছেন, কাজেই বের হয়ে গেছি।

বাইরে কোথাও না গিয়ে তুমি আমার এখানে চলে আসতে।

আমি বললাম, আপনার এখানে কেন আসব? আপনি আমার কেউ না।

আমি তোমার কেউ না?

না।

আহসান সাহেব বললেন, যার কাছে গিয়েছ সেও তো তোমার কেউ না।

আমি বললাম, উনি একজন লেখক, আমিও একজন লেখিকা, এই পরিচয়ে গিয়েছি। লেখকে লেখকে ধূল পরিমাণ।

বাবার সঙ্গে কী নিয়ে তোমার ঝগড়া হলো সেটা বলো।

আমি শান্ত ভঙ্গিতে বললাম, আমি মাকে বলেছি আপনি আমার প্রেমে পড়েছেন। ঠাট্টা করে বলেছি। মা ঠাট্টাটা সত্যি ভেবে নিয়ে বাবার কাছে লাগিয়েছেন।

আমি তোমার প্রেমে পড়েছি–এই কথা বলেছ?

হ্যাঁ।

এমন একটা Absurd কথা তুমি বলতে পারলে?

ঠাট্টা করে বলেছি।

জীবনটা ঠাট্টা তামাশার ব্যাপার না। এটা মনে রাখবে।

জি আচ্ছা মনে রাখব। এখন কি বাসায় যেতে পারব?

যাও। রেস্ট নাও। মাথা ঠান্ডা করো।

আমি বাসায় গেলাম। পরদিন থেকে সব আগের মতো হয়ে গেল, শুধু আহসান সাহেবের ড্রাইভার কিসমতের চাকরি চলে গেল।

৪. আমি স্বেচ্ছা কারাবন্দি

আমি স্বেচ্ছা কারাবন্দি। নিজের ঘরে সারা দিন কাটাই। আমার এই নতুন ঘরটা বেশ বড়, সঙ্গে বাথরুম আছে। টিভি আছে। বড় মামা তাঁর বাড়ি থেকে দুটা ডিভিডি প্লেয়ার এনেছিলেন। একটা আমি নিয়ে নিয়েছি। ডিভিডি প্লেয়ারে ছবি দেখি। ছাদে যাই না, আহসান সাহেবের ঘরে যাই না। ঠিক করেছি তিন মাস এইভাবে থাকব। তবে আহসান সাহেব ডেকে পাঠালে ভিন্ন কথা। তখন সেজেগুজে যাব। শাড়ি পরব, ঠোঁটে লিপস্টিক দেব, চোখে কাজল দেব। যারা কখনো সাজে না, তারা হঠাৎ সাজলে খুব সুন্দর দেখায়। আর আমি তো যথেষ্ট রূপবতী। মা কথায় কথায় বলেন, "আমার পরীর মতো মেয়ে। আমরা কেউ কখনো পরী দেখি নি, কিন্তু কথায় কথায় পরীর সঙ্গে তুলনা দেই। মহিলা জ্বিনকেই নাকি বলে পরী। তাই যদি হয় আমরা কেন বলি না "জ্বিনের মতো ছেলে? বিষয়টা নিয়ে আহসান সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে হবে। তিনি যেদিন ডেকে পাঠাবেন সেদিনই এই প্রসঙ্গ তুলব। বাসা ছেড়ে চলে যাওয়ার পর দশ দিন কেটেছে এখনো তিনি ডাকেন নি। মনে হয় ডাকবেন না। না ডাকলে নাই।

ডাকলে নাই
তাই তাই তাই ॥

দুপুরে খাওয়ার সময় হয়েছে। মা আমার ঘরের দরজায় ধাক্কা দিয়ে বললেন, লিপি, খেতে আয়।

আমি বললাম, খেতে আসতে পারব না। তুমি একটা ট্রেতে করে এই ঘরে খাবার দিয়ে যাও।

কেন?

এখন থেকে আমি এই ঘর থেকে বের হব না। ঘরেই খাওয়াদাওয়া করব।

কারণ কী?

মা, আমার তিন মাসের জেল হয়েছে। এই ঘরটা হলো আমার জেলখানা।

কে তোকে জেল দিয়েছে?

আমি নিজেই নিজেকে দিয়েছি। বিনাশ্রম কারাদণ্ড।

দরজা খোল, তোর সঙ্গে কথা বলি।

আমি দরজা খুলব না মা।

কিছুক্ষণ পর সকিনা খাবার দিতে এসে মুখ বাঁকা করে হাসল। আমি বললাম, হাসছ কেন?

সকিনা বলল, হাসি না তো আপা। আমার মুখটা বেঁকা। এইজন্যে মনে হয় হাসতেছি।

আমাদের বাসায় খাবারের মান এক ধাপে অনেকটা উন্নত হয়েছে। বড় মামার অবদান। আজ দুপুরের আইটেম হলো, ছোট আলু দিয়ে কই মাছ, ইলিশ মাছ ভাজি, সরিষা বাটা দিয়ে মানকচুর একটা ঝোল। এই আইটেমটা সবচেয়ে ভালো। তিন পদের তরকারি দিয়ে আমাদের বাসায় এর আগে কখনো রান্না হতো না। এখন হচ্ছে। মাঝে মাঝে চার পদেরও হয়।

বড় মামা ভালো আছেন এবং সুখে আছেন। তিনি সারা সকাল খবরের কাগজ পড়েন। বাসায় চারটা পত্রিকা রাখা হয়। একটা ইংরেজি, তিনটা বাংলা। বড় মামা ইংরেজি পত্রিকা পড়া দূরের কথা, ভাঁজও খুলেন না। যে পত্রিকা পড়া হয় না, সেই পত্রিকা কেন রাখা হয় আমি জানি না। নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে। আহসান সাহেব বলেন, আমাদের পৃথিবী হলো কার্যকারণের পৃথিবী। সব ঘটনার পেছনে কারণ থাকবে। অকারণে কিছুই ঘটবে না। Cause and effect.

মামার কাছে সপ্তাহে তিন দিন গোঁফওয়ালা অত্যন্ত বলশালী বেঁটে এক লোক আসছে। বড় মামাকে প্রায় নেংটো করে সারা গায়ে তেল মালিশ করে দলাই মলাই করছে। এই সময় মামা আহ্ উহ্ করে ব্যথা এবং আরামের মিলিত ধ্বনি তুলছেন। অতি কুৎসিত দৃশ্য।

আমি মামাকে একদিন বললাম, বড় মামা! তুমি তো ঘোড়া হয়ে যাচ্ছ।

বড় মামা খরখরে গলায় বললেন, ঘোড়া হয়ে যাচ্ছি মানে কী?

ঘোড়াকে প্রতিদিন দলাই-মলাই করতে হয়, তোমাকেও করতে হয়, এইজন্যে বললাম। সরি, ঠাট্টা করেছি।

আমি কি তোমার ঠাট্টা-সম্পর্কীয় কেউ?

জি-না মামা।

নিজের চরকায় তেল দাও। পরের চরকায় না।

জি আচ্ছা মামা।

বড় মামা মনে হয় কলেজের চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছেন। কলেজে যান না। কলেজের চাকরি ছেড়ে দেওয়ার জন্যেই হয়তো আগের মতো মাস্টারি প্রশ্ন করেন না।

বড় মামার বিষয়ে আমি এখন ভয়ংকর একটা কথা বলব। পুরোপুরি ভোলাসা করে বলব না। রাখঢাক করে বলব। যার বোঝার সে বুঝবে। না বুঝলে নাই।

না বুঝলে নাই
তাই তাই তাই।

বড় মামার ড্রয়ারে আমি একটা প্যাকেট দেখেছি। কিসের প্যাকেট? এই তো হলো সমস্যা। একটা বড় প্যাকেটে অনেকগুলো ছোট ছোট প্যাকেট। ছোট প্যাকেটে বেলুনের মতো একটা জিনিস থাকে। ফুঁ দিলে বেলুন হয়ে যায়। এখনো পরিষ্কার হয় নি? না হলে কিছু করার নাই।

সূচিপত্র

প্রথম যেদিন প্যাকেট দেখলাম সেদিন তেরটা ছোট প্যাকেট ছিল। এখন আছে এগারটা। অর্থাৎ দুটো ব্যবহার হয়েছে। খুবই ভয়ংকর।

প্যাকেটের সন্ধান কীভাবে পেলাম বলি। মামা ঘর থেকে বের হওয়ার সময় ঘর সবসময় তালা দিয়ে যান। বেশ ভারী তালা।

আমি আমার ঘরের তালাচাবি ঠিক করার সময় একজন চাবিওয়ালাকে খবর দিলাম। মামা তখন ঘরে ছিলেন না। আমি চাবিওয়ালাকে দিয়ে মামার ঘরের তালার চাবি বানিয়ে নিলাম। এখন ইচ্ছা করলেই মামার ঘরে আমি ঢুকতে পারি। মাঝে মাঝে ঢুকি। মামার ঘরে বড় একটা স্টিলের ট্রাংক আছে। সেটাতেও তালা। চাবিওয়ালাকে দিয়ে আমি এই ট্রাংকও খোলাব। সুযোগ পাচ্ছি না। চাবিওয়ালাকে তাহলে মামার ঘরে ঢোকাতে হবে। মা বা সকিনা দেখে ফেলবে।

আমি অপেক্ষা করছি কোনো একদিন মা তার এক বান্ধবীর বাসায় যাবেন। মার এই বান্ধবী মিরপুরে থাকেন। মা তার সঙ্গে দেখা করতে গেলে সকিনাকে সঙ্গে নিয়ে যান এবং সারা দিন থাকেন। মার এই বান্ধবীর নাম মরিয়ম। তিনি নাকি মহিলা পীর। দুনিয়ার মহিলা তাকে ঘিরে থাকে। যেদিন দেখব মা নেই, সকিনা নেই, তারা গেছে মহিলা পীরের দরবারে এবং বড় মামা বাইরে গেছেন, সঙ্গে সঙ্গে চাবিওয়ালাকে টেলিফোন করব। চাবিওয়ালার মোবাইল ফোনের নম্বর আমি রেখে দিয়েছি। বাংলাদেশে বাস করার এই সুবিধা, এখন সবার কাছে মোবাইল ফোন। একসময় দেখা যাবে সব ভিক্ষুকের হাতেও মোবাইল ফোন। তারা ভিক্ষা করতে আসার আগে মোবাইলে কল দিবে–মা, ভিক্ষা নিতে কি। আসব? কিছু মিলবে?

বড় মামাকে আমি ভৌতিক ট্রিটমেন্ট দেব বলে ঠিক করেছি। তিনি চাবি খুলে ঘরে ঢুকে দেখবেন–বিছানায়, মেঝেতে এবং বাথরুমে টাটকা রক্ত। কয়েকবার এ রকম দেখলে তার খবর হয়ে যাবে। এখন টাটকা রক্ত পাওয়াই সমস্যা। বাজারে তো আর মানুষের রক্ত প্যাকেট করে বিক্রি করে না। তবে মানুষের রক্তই যে লাগবে তা না, গরু-ছাগলের রক্ত হলেও চলবে।

আমি লেখক হুমায়ূন স্যারের পিওনকে দিয়ে রক্ত জোগাড় করার পরিকল্পনা করেছি। তার সঙ্গে ভালো খাতির জমিয়েছি। তার নিজের মোবাইল নম্বর সে আমাকে দিয়েছে। মাঝে মাঝে খেজুরেটাইপ কথা বলে খাতির বজায় রাখছি। গতকাল রাত নটার সময় টেলিফোন করে বললাম, মোস্তফা ভাই, কেমন আছেন? সে বিগলিত গলায় বলল, ভালো আছি আপা।

আপনার স্যার কি রেস্টে আছেন?

না। স্যার ম্যাডামের সঙ্গে মুভি দেখেন।

মুভির নাম কী?

নাম তো জানি না।

মোস্তফা ভাই! নামটা জেনে দিবেন। আমিও ওই মুভিটা দেখব। আপনি মনে হয় জানেন না, আমিও আপনার স্যারের মতো লেখক। উনি যেসব মুভি দেখেন। আমারও সেসব দেখা প্রয়োজন। বুঝেছেন?

জি আপা!

আপনার ছেলে কেমন আছে?

ভালো আছে।

নাম বাবু, তাই না?

তার মা বাবু ডাকে। আমি ডাকি হিমু। স্যারের বই থেকে নাম নিয়েছি।

ভালো করেছেন। আপনার কোনো মেয়ে হলে আমাকে বলবেন। আমি আমার বই থেকে নাম দিয়ে দিব।

জি আচ্ছা।

আপনার ছেলে হিমুর ডায়রিয়া হয়েছিল বলেছিলেন, এখন সেরেছে?

জি।

ওরস্যালাইন খাওয়াচ্ছেন? ডায়রিয়ায় বডি ডিহাইড্রেটেড হয়ে যায়। ওরস্যালাইন খেয়ে ঠিক করতে হয়। বুঝেছেন?

জি আপা।

পরেরবার যখন দেশে যাবেন আমার সঙ্গে দেখা করে যাবেন। আমি হিমুর জন্যে একটা গিফট কিনে রেখেছি। গিফট নিয়ে যাবেন। হলুদ পাঞ্জাবি, হলুদ পায়জামা।

জি আচ্ছা আপা।

ভালো কথা মোস্তফা ভাই আমাদের স্কুলের একটা সায়েন্স প্রজেক্টে গরু বা ছাগলের রক্ত লাগে। জোগাড় করে দিতে পারবেন?

রক্ত কই পাব আপা?

কী আশ্চর্য মোস্তফা ভাই! আপনি এমন একজন বুদ্ধিমান মানুষ হয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করছেন, রক্ত কই পাব? আমি জানি নাকি? নিউ মার্কেটের কসাইদের কাছে খোঁজ নিয়ে দেখেন।

জি আচ্ছা আপা। কতটুক রক্ত লাগবে?

প্রথম দফায় এক লিটার লাগবে। পরে আবার লাগবে। রক্ত জোগাড় হলেই মোবাইলে আমাকে মিসকল দিবেন।

জি আচ্ছা আপা।

রক্তের জন্যে অপেক্ষা। রক্ত এলেই বড় মামার চিকিৎসা শুরু হবে। জল চিকিৎসার মতো রক্ত-চিকিৎসা।

.

বড় মামার বিষয়ে বাবার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। আরে না ছোট প্যাকেট বিষয়ে না। বাবার সঙ্গে এইসব বিষয় নিয়ে কথা বলা যায় নাকি? মার সঙ্গে কথা বলা যায়। তবে এখনো না। সময় হোক তখন বলব।

বাবা আমার ঘরে ঢুকে দরজা ভিজিয়ে গলা নামিয়ে বললেন, তোমার বড় মামা বিষয়ে কিছু কথা বলব।

আমি বললাম, বলো। তবে আজেবাজে কিছু বলবে না। উনি সুফিটাইপ মানুষ।

বাবা অবাক হয়ে বললেন, সে সুফি?

আমি বললাম, মার তা-ই ধারণা। বড় মামা উল্টাপাল্টা কাজ যা করেন, মামির ঠেলাঠেলিতে করেন। এখন মামি যেহেতু সঙ্গে নেই, বড় মামা পুরোপুরি সুফি।

তোমার মার এই ধারণা?

হুঁ।

তাহলে তো আর বলার কিছু নাই।

আমি বললাম, তারপরেও কিছু বলার থাকলে বলো।

বাবা বললেন, ডেভেলপারকে দিয়ে তোমার মামা যে দশতলা দালান তুলছে। এটা নিয়ে খটকা।

বলো, শুনি কী খটকা?

ডেভেলপারেরা তো জমির মালিকদের সঙ্গে চুক্তি করবে। তোমার মা-ও তো জমির মালিক। তার সঙ্গে তো কোনো চুক্তি হয় নাই।

তাহলে মা মনে হয় জমির মালিক না। বড় মামাই মালিক।

সেটা কীভাবে সম্ভব?

এই দুনিয়ায় সবই সম্ভব।

তুমি কি বিষয়টা নিয়ে তোমার বড় মামার সঙ্গে আলাপ করবে?

আমি আলাপ করব কোন দুঃখে! তোমার খটকা তুমিই আলাপ করো।

আমাকে লোভী ভাববে।

তোমাকে লোভী ভাবলে ক্ষতি তো কিছু নাই। তুমি তো লোভী। লোভীকে লোভী ভাবা দোষের কিছু না। তারপরেও লজ্জা লাগলে মাকে বলো জিজ্ঞেস করতে।

তোমার মাকে বলেছিলাম, সে কান্নাকাটি করে বিশ্রী অবস্থা করেছে। আমাকে ছোটলোক বলেছে। এখন কী করা যায় বলো তো?

ঝিম ধরে থাকো। আর কী করবে?

বাবা কিছুক্ষণ ঝিম ধরে থেকে বের হয়ে গেলেন। মনে হচ্ছে আজ সারা দিন তিনি ঝিম ধরেই থাকবেন।

নিম ফুলের মৌ পিয়ে ঝিম ধরেছে ভোমরা
ঝিম ধরেছে ভোমরা
ঝিম ধরেছে ভোমরা।
বাবা এখন ভোমরা!

.

আজ সোমবার।

আমার খারাপ দিবস। আজও নিশ্চয়ই ভয়ংকর কিছু ঘটবে। ঘটুক। আমিও বাবার মতো ভোমরা হয়ে যাব। অনেকদিন পর উপন্যাস লিখতে বসলাম।

আমার বড় মামার ঘরে ভূতের উপদ্রব হয়েছে। তিনি বাইরে থেকে ফিরে ঘরের তালা খুলে দেখেন–ঘর রক্তে ভেজা। মেঝেতে রক্ত, বিছানায় রক্ত, এমনকি বাথরুমেও রক্ত। বড় মামা চোখ কপালে তুলে বললেন, কী ব্যাপার? এইসব কী?

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

আমি বললাম, মনে হচ্ছে রক্ত।

বড় মামা বললেন, ঘরে রক্ত আসবে কেন?

আমি বললাম, তুমি যখন থাকো না তখন মনে হয়। কোনো ড্রাকুলা এসেছিল...।

এই পর্যন্ত লিখে আমি কেটে ফেললাম। লেখা পছন্দ হয় নি। সত্যি সত্যি রক্ত ঢেলে দেখতে হবে বড় মামা কী বলেন। তারপর লিখতে হবে। নয়তো লেখায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা পাবে না।

দুপুরে আহসান সাহেবের গাড়ির নতুন ড্রাইভার এসে আমাকে বলল, স্যার আপনারে আইজ দুপুরে তাঁর সঙ্গে খানা খেতে বলেছেন!

আমি বললাম, উনাকে গিয়ে বলল সোমবার আমি ঘর থেকে বের হই না। আচ্ছা থাক কিছু বলতে হবে না।

মা রান্না করছিলেন, আমি মাকে বললাম, মা তোমার একটা সুন্দর শাড়ি দাও তো। হালকা সবুজ রঙের শাড়ি থাকলে ভালো হয়।

কী করবি?

আমি বললাম, শাড়ি দিয়ে মানুষ কী করে মা? হয় সিলিং ফ্যানে ঝুলিয়ে সুইসাইড করে, আর না হলে পরে। আমি পরব।

শাড়ি এখন পরবি?

হ্যা এখন। বাবার বন্ধু এবং বস আহসান সাহেব আমাকে আজ দুপুরে খেতে বলেছেন। সেজেগুজে যেতে হবে।

সেজেগুজে যেতে হবে কেন?

উনি বলেছেন এইজন্যে। বিশেষভাবে বলেছেন আমি যেন শাড়ি পরে যাই। শাড়ি পরলে আমাকে কেমন দেখায় তা তিনি দেখতে চান।

আমার কথা শুনে মার হাতের খুন্তি মেঝেতে পড়ে গেল। আমি বললাম, মা, তোমার কাজলদানিতে কি কাজল আছে? উনি বলেছেন আমি যেন অবশ্যই চোখে কাজল দেই। মেয়েদের চোখে কাজল তার নাকি খুব পছন্দ।

মা কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, লিপি! মা, এইসব কী বলছিস?

আমি হাই তোলার মতো ভঙ্গি করে বললাম, যা সত্যি তা-ই তোমাকে বলেছি। তবে তুমি যদি বলো না যেতে তাহলে যাব না।

মা বললেন, যাওয়ার দরকার নেই। বলে দে তোর জ্বর, শুয়ে আছিস।

তারপর যদি ডাক্তার নিয়ে চলে আসেন তখন কী হবে? উনি আমাদের ওপর রাগ করলেও তো বিরাট সমস্যা।

কী সমস্যা?

বাবার চাকরি চলে যাবে। আমাদের এই বাসা ছেড়ে দিতে হবে।

মা করুণ চোখে তাকিয়ে আছেন। তাকে দেখে মায়া লাগছে।

আজ সোমবার, কিন্তু আজকের সোমবার অন্য দিনের মতো না। আমার জীবনে ভালো ভালো জিনিস ঘটছে। মোস্তফা ভাই কোকের বোতলে করে প্রায় এক বোতল রক্ত নিয়ে এসেছেন। এখন রক্ত-চিকিৎসা শুরু করতে পারব।

আহসান সাহেব এই প্রথম আমাকে শাড়ি পরা অবস্থায় দেখলেন। তিনি যে খানিকটা থতমত খেয়ে গেছেন তা বুঝতে পারছি। মেয়েরা কিছু কিছু জিনিস বুঝতে পারে। থতমত খাওয়া পুরুষ চোখ নামিয়ে নেয়। তখন তার দৃষ্টি হয়। এলোমেলো। থতমত ভাব কাটানোর চেষ্টার কারণে চেহারায় বিরক্তি চলে আসে। এই বিরক্তি নিজের ওপর।

আহসান সাহেব বললেন, উপন্যাস লেখা কি বন্ধ?

বন্ধ কেন? আধাপৃষ্ঠা লিখেছিলাম। পছন্দ হয় নি বলে ফেলে দিয়েছি।

ভালো করেছ। ফেলে দেওয়া অভ্যাস করতে হবে। লেখকের সবচেয়ে বড় বন্ধু হলো ডাস্টবিন। অপছন্দের লেখা ডাস্টবিনে ফেলতে পারা ভালো গুণ। কেউ কেউ আছে কিছুই ফেলতে পারে না।

আমি মিষ্টি করে হাসলাম। উনি আবারও থতমত খেলেন। বুঝতেই পারছি তিনি কথা খুঁজে পাচ্ছেন না। হাতড়ে বেড়াচ্ছেন। যাক, শেষ পর্যন্ত কথা খুঁজে পেলেন।

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

আধাপৃষ্ঠা কী লিখেছিলে যে ফেলে দিতে হলো?

ভৌতিক কিছু করতে চেয়েছিলাম। তালাবন্ধ ঘর খুলে দেখা গেল ঘরের মেঝেতে, বিছানায়, বাথরুমে রক্ত।

তিনি বললেন, ইন্টারেস্টিং!

লেখাটা ইন্টারেস্টিং হয় নি। ফালতু হয়েছে।

আবার লেখো। রবার্ট ব্রুস হয়ে যাও।

আমি বললাম, আচ্ছা।

তিনি বললেন, শাড়িতে তোমাকে মানিয়েছে। মাঝে মাঝে শাড়ি পরবে। শাড়ির যে ক্ষমতা আছে পৃথিবীর অন্য কোনো পোশাকের এই ক্ষমতা নেই।

কী ক্ষমতা?

শাড়ি একটা মেয়ের পার্সোনালিটি বদলে দিতে পারে।

আমি উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললাম, যাই।

তিনি অবাক হয়ে বললেন, যাই মানে! তোমাকে দুপুরে আমার সঙ্গে লাঞ্চ করার জন্যে ডেকেছি।

আমি বললাম, মা খুব দুশ্চিন্তা করছেন তো, এইজন্যে চলে যেতে হবে। দুশ্চিন্তা করছেন কেন?

আমি বললাম, মা মোটামুটি নিশ্চিত, আমি আপনার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছি। এইজন্যেই দুশ্চিন্তা করছেন। পাত্র খুঁজছেন আমাকে বিয়ে দিয়ে দেওয়ার জন্যে। মার ধারণা বিয়ে হলে আমার পাগলামি সেরে যাবে। পাত্র খোঁজা হচ্ছে, একজন পাওয়া গেছে।

তিনি বললেন, লিপি, পাঁচ মিনিট বসো। আমার কথা শুনে চলে যেয়ো। আমার সঙ্গে লাঞ্চ করতে হবে না। তোমার খাবার পাঠিয়ে দেব।

আমি বসলাম। তিনি বললেন, তোমার মা বলছেন বিয়ের পর তোমার পাগলামি সেরে যাবে। কথা কিন্তু ঠিক। তবে বিয়ে না করলেও পাগলামি সারবে। তোমার যা হয়েছে তার নাম Calf love, বাংলায় বাছুর প্রেম। Calf love-এ তীব্র আবেগ থাকে, তবে তা হয় ক্ষণস্থায়ী।

আমি বললাম, ও আচ্ছা।

তিনি বললেন, বাছুর প্রেমের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তোমার কল্পনাশক্তি। নানান কিছু তুমি কল্পনা করছ। এডোলেসেন্ট পিরিয়ডে কল্পনা মানুষকে রিয়েলিটির বাইরে নিয়ে যায়। বুঝেছ?

হুঁ।

তোমার জন্যে যে পাত্র পাওয়া গেছে, সে কী করে?

সে দর্জি।

আহসান সাহেব হতভম্ব গলায় বললেন, কী বললে? দর্জি?

আমি বললাম, মেয়েদের ব্লাউজ বানানো টাইপ দর্জি না। স্যুট কোট এইসব কাটে। মাস্টার টেইলর। ময়মনসিংহে তাদের বিশাল দোকান। ছেলের বাবা মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। পাঁচ নম্বর সেক্টরে বাবার সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন।

বাড়ি কোথায় বললে? ময়মনসিংহ?

জি। লেখক হুমায়ূন স্যারের দূরসম্পর্কের আত্মীয় হন। হুমায়ুন স্যার বলেছেন, ছেলে খুবই ভালো।

তার সঙ্গে কি এখন তোমার খাতির হয়ে গেছে?

তা না। আমার লেখা নিয়ে তাঁর কাছে গিয়েছি। তখন থেকে পরিচয়। আমার উপন্যাসের একটা নাম তিনি দিয়েছেন। তিনি নাম রেখেছেন দাঁড়কাকের সংসার। নামটা ভালো হয়েছে না?

তোমার লেখা উনি পড়েছেন?

হুঁ। যা-ই লিখি তাঁকে পড়াই। শাওন আপুকেও পড়াই।

শাওন আপুটা আবার কে?

উনার স্ত্রী। ভৌতিক যে অংশটা লিখে ফেলে দিয়েছি, সেটা শাওন আপু খুবই পছন্দ করেছিলেন। হুমায়ূন স্যার যেই বললেন, ভালো হয় নি, সঙ্গে সঙ্গে ফেলে দিয়েছি। শাওন আপু তো আর লেখক না। তাঁর কথায় গুরুত্ব দেব কেন?

আহসান সাহেব কিছুই বললেন না, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। তবে আমার কথায় বড় রকমের ধাক্কা যে তিনি খেয়েছেন তা বুঝলাম যখন দুপুরে আমার জন্যে কোনো খাবার এল না। খাবার পাঠানোর মতো মনের অবস্থা হয়তোবা তার ছিল না। কিংবা এও হতে পারে যে, তিনি ভুলে গেছেন।

সন্ধ্যাবেলা বড় মামা আমাকে ডেকে পাঠালেন। গম্ভীর গলায় বললেন, ফরিদার কাছে শুনলাম তুমি নাকি আজ সেজেগুজে চোখে কাজল দিয়ে বাড়িওয়ালার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছ?

ঠিকই শুনেছেন। ফটোসেশন ছিল তো, এইজন্যেই সেজেগুজে যাওয়া।

ফটোসেশন মানে?

আমার ছবি তোলা হলো। ফটোগ্রাফার হলেন মবিন সাহেব। গ্ল্যামার ফটোগ্রাফিতে তাঁর মতো কেউ বাংলাদেশে নাই।

ফটোসেশন হলো কেন?

কারণ আছে। এখন বলা যাবে না।

কেন বলা যাবে না? তোমার এবং বাড়িওয়ালা বুড়োটার মধ্যে সম্পর্কটা কী আমাকে বলো। ঝেড়ে কাশো।

আমি বললাম, কাশি থাকলে তবেই না ঝেড়ে কাশার প্রশ্ন আসে। আমার কোনো কাশি নেই।

বড় মামা বললেন, তুমি অবাধ্য, দুর্বিনীত বখাটে একটি মেয়ে। A spoiled Girl, বুঝেছ?

আমি বললাম, এখনো বুঝতে পারি নি। আপনি বুঝিয়ে দিন।

মা পুরো বিষয় ধামাচাপা দেওয়ার জন্যে বললেন, ভাইজান, বাদ দিন। লিপির বয়স কম। সে কী বলে না বলে নিজেও জানে না।

বড় মামা বললেন, তোমরা জানতে দাও না বলে জানে না। এই মেয়ে আমার ঘরে জন্ম নিলে সরলরেখা বানিয়ে ছেড়ে দিতাম।

রাতে বড় মামা দুই দফা মিটিং করলেন। মার সঙ্গে মিটিং, বাবার সঙ্গে মিটিং।

রাত সাড়ে এগারটার দিকে বাবা আমার ঘরে ঢুকলেন। তাঁর চিন্তিত শুকনা মুখ দেখে আমার খুব মায়া লাগল। তাঁকে খুশি করার জন্যে বললাম, বাবা! তোমাদের তাহেরপুর অপারেশনের গল্পটা আরেকবার বলো তো।

কেন?

আমাকে একটা রচনা লিখতে হবে–মুক্তিযোদ্ধার স্বপ্ন।

বাবার মুখের চিন্তিতভাব মুহূর্তে দূর হয়ে গেল। তিনি তাহেরপুর অপারেশনের গল্প শুরু করলেন।

তারপর ঘটনা শোনো। চব্বিশ ঘণ্টা পর প্রথম পেটভর্তি খিচুড়ি খেলাম। খিচুড়ি আর মোরগের সালুন। খাওয়াদাওয়ার পর ঘুমে চোখ বন্ধ হয়ে আসছে, এমন সময় আমাদের কমান্ডার সালেহ চৌধুরী বললেন, অস্ত্র হাতে নাও। আমরা তাহেরপুর যাব।...

বাবার গল্প পুরোটা শোনা গেল না। প্রতিমা এসেছে। সে দরজার ওপাশ থেকে চোখে ইশারা করছে।

আমি বাবাকে বললাম, তোমার তাহেরপুর অপারেশনের গল্প শোনার জন্যে প্রতিমাও চলে এসেছে। বাবা আমাকে দশ মিনিট সময় দাও। প্রতিমার সঙ্গে জরুরি কিছু কথা বলব, তারপর দুজনে মিলে তোমার গল্প শুনব।

বাবা বললেন, অবশ্যই। মনে করিয়ে দিস, গৌরাঙ্গের কথা বলব। সব সময় তার কথা মনে থাকে না। অসাধারণ চরিত্র। বীর উত্তম পদক পাওয়া উচিত ছিল। কিছুই পায় নি। এখন শুনেছি সুনামগঞ্জ শহরে রিকশা চালায়। আফসোস আফসোস।

প্রতিমা আমার কাছে বিশেষ কাজে এসেছে। সে আমার উপন্যাসের শুরুটা লিখে এনেছে। তার শুরু এ রকম–

আমাদের বাড়ির রেলিংয়ে একটা দাঁড়কাক এসে বসেছে।
দাঁড়কাকটা সাইজে যথেষ্টই বড়। তার চোখ টকটকে লাল।
সে লাল চোখে আমাকে দেখছে।

আমার খানিকটা লজ্জা লজ্জা লাগছে। কারণ আমার
গায়ে কোনো কাপড় নেই। আমি সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে আমার ঘরে
অপেক্ষা করছি। কার অপেক্ষা? শুভ্রর জন্যে অপেক্ষা। শুভ্র
এখন মার সঙ্গে রাজনীতির গল্প করতে করতে চা খাচ্ছে।
তার বাসায় ফিরে যাওয়ার সময় হয়েছে। ফিরে যাওয়ার
আগে সে আমার কাছ থেকে বিদায় নিতে এসে দেখবে
নেংটো কন্যা বসে আছে।

প্রতিমা বলল, এই পর্যন্ত লিখেছি। ঠিক আছে?

আমি বললাম, ঠিক আছে। তবে শুভ্র নাম দেওয়া যাবে না। শুভ্র হুমায়ূন আহমেদের ক্যারেক্টার। অন্যের চরিত্র নিয়ে কাজ করব না। এখন চল মুক্তিযুদ্ধ সেশান। বাবা গল্প বলার জন্যে জিহ্বা শাণ দিয়ে বসে আছেন।

৫. রক্ত-চিকিৎসার প্রস্তুতি সম্পন্ন

রক্ত-চিকিৎসার প্রস্তুতি সম্পন্ন।

বড় মামার ঘরে কোকের বোতলের এক বোতল রক্ত ঢেলে এসেছি। বোতলে রক্ত জমাট বেঁধে গিয়েছিল। গরম পানি দিয়ে ঝাঁকিয়ে ঠিক করা হয়েছে। তিন জায়গায় রক্ত ঢালা হয়েছে–মামার টেবিলে, মেঝেতে, বাথরুমের বেসিনে। বাথরুমের বেসিনের রক্ত সবচেয়ে ভালো ফুটেছে। ধবধবে সাদা বেসিনে টকটকে লাল রক্ত। বিছানায় খানিকটা ঢালার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু বিছানার চাঁদরটা মেরুন রঙের, রক্ত ফুটবে না।

বাসায় সবাই আছে, শুধু বড় মামা নেই। উনি ঘরে ঢুকলেই খেলা শুরু হবে। আইজ পাশা খেলব রে শ্যাম। বড় মামার অবস্থা কী হয় তা দেখার জন্যে ছটফট করছি।

মা রান্নাঘরে, মোরগপোলাও রান্না করছেন। সকিনা তাকে সাহায্য করছে। বাবা টিভি ছেড়েছেন, ফুটবল খেলা দেখছেন। ফুটবল খেলার দর্শক হিসাবে বাবা আদর্শ। তিনি কোনো দলকেই সাপোর্ট করেন না। সবাইকে গালাগালি করেন। বাবার গালাগালি আমার কাছে ফুটবল খেলার চেয়েও ইন্টারেস্টিং লাগে।

এই মুহূর্তে বাবা চেঁচাচ্ছেন, সবাই মিলে এটার পাছা বরাবর লাথি দেয় না কেন? বদের বাচ্চা। খেলা জানস না খেলতে আসছস কী জন্য? বাড়িতে গিয়ে ছাগলের দুধ খা বদমাইশ!

গালাগালির এই পর্যায়ে বড় মামা বাড়িতে ঢুকলেন। তালা খুলে নিজের ঘরে দাখিল হলেন। কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। বড় মামা কি রক্তের বিষয়টা স্বাভাবিকভাবে নিয়েছেন?

নাকি এখনো তাঁর চোখে পড়ে নি। টেনশনে আমার শরীর কাঁপা শুরু হয়েছে। একবার কি উঁকি দিয়ে দেখব?

হঠাৎ করেই মামার বিকট চিৎকার শুরু হলো।

ফরিদা কোথায়? ফরিদা! এই, কে আছে বাসায়? এই এই এই?

আমরা সবাই হুড়মুড় করে বড় মামার রুমে ঢুকলাম। বড় মামা বাবার দিকে। তাকিয়ে হুঙ্কার দিলেন, এইসব কী? ভাবটা এ রকম যেন, ঘটনা বাবা ঘটিয়েছেন।

বাবা বললেন, রক্ত নাকি? রক্ত কোত্থেকে এল?

রক্তের কথা শুনে সকিনা ও আল্লাগো, মাইনষের রক্ত! বলে মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়ার ভঙ্গি করল।

বাবা বললেন, ন্যাকামি করিস না। রক্ত কোনোদিন দেখস নাই? ফুটবল প্লেয়ারের মতো অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাচ্ছিস! তোকে কেউ ল্যাং মেরেছে?

বড় মামা বাবার দিকে তাকিয়ে বিরক্ত গলায় বললেন, রক্ত কোথা থেকে এসেছে সেটা নিয়ে কথা বলো। খামাকা চেঁচাচ্ছ কেন?

বড় মামার কথা শেষ হওয়ার আগেই মা চেঁচিয়ে উঠলেন, ভাইজান, বাথরুম ভর্তি রক্ত। মাবুদে খোদা! এইসব কী?

পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হয়েছে। বাবা তার বন্ধু ও বস আহসান সাহেবকে ডেকে এনেছেন। তিনি গম্ভীর মুখে রক্ত দেখে আমার দিকে তাকালেন। তাঁর দৃষ্টিতে চাপা হাসি এবং কিছুটা আনন্দ।

আহসান সাহেব আমাকে বললেন, লিপি, আমি বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করছি। তুমি এক কাপ চা নিয়ে ওপরে আসো।

আমি বললাম, জি আচ্ছা চাচা।

আহসান সাহেব থতমত খেলেন। এই প্রথম আমি তাঁকে চাচা ডাকলাম।

আমি চা নিয়ে নিজে গেলাম না। সকিনাকে দিয়ে পাঠালাম। আমি নিজের কোর্টে বল নিয়ে আসতে শুরু করেছি। আমি জানি আহসান সাহেবের আমার সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছা করছে। আমাকে না দেখে সেই ইচ্ছাটা আরও বাড়বে। আমি এর ভেতর দিয়ে গিয়েছি। আমি জানি।

সকিনা ফিরে এসে বলল, বড় স্যার আপনেরে টেলিফোন করতে বলেছে।

আমি টেলিফোন করলাম না। উনার এখন অপেক্ষার পালা। আমার অপেক্ষার পালা শেষ হয়েছে।

আমার প্রেম যদি বাছুর প্রেম হয়, তারটা তাহলে কী? বৃদ্ধ গরু প্রেম? বৃদ্ধ গরু প্রেমও কি বাছুর প্রেমের মতো কঠিন? দেখা যাক। আমি টেলিফোন না করলে উনি আমাকে করতে পারবেন না। কারণ আমার নম্বর তিনি জানেন না। কোনোদিন জানার আগ্রহ দেখান নি।

সাত দিন আগের কথা। অনেক ঘ্যানঘ্যানানির পর বাবা আমাকে মোবাইল ফোন কিনে দিয়েছেন। চার হাজার তিন শ টাকা দাম। মোবাইল ফোন নিয়ে প্রথমেই আহসান সাহেবের কাছে গেলাম। আনন্দে খলবল করতে করতে বললাম, এই যে আমার মোবাইল ফোন।

উনি বললেন, বাহ্ সুন্দর তো! মোবাইলে কম্যুনিকেশন কীভাবে হয় জানেন?

আমি বললাম, না।

কমুনিকেশন হয় মাইক্রোওয়েভে। এখন বলল, মাইক্রোওয়েভ কী?

আমি জানি না মাইক্রোওয়েভ কী।

জানতে চাও?

না, চাই না। আমি আর্টস-এর ছাত্রী, শুধু শুধু সায়েন্সে যাব না। কম জানা যেমন খারাপ, বেশি জানাও খারাপ।

তিনি বিরক্তির মতো ভঙ্গি করলেন।

আমি বললাম, আপনার মোবাইল নম্বরটা দিন।

উনি অবাক হওয়ার মতো করে বললেন, কেন?

আপনাকে টেলিফোন করব।

আমাকে কেন টেলিফোন করবে? তুমি টেলিফোন করবে তোমার বন্ধু বান্ধবকে। আর তোমার সঙ্গে তো আমার দেখা হচ্ছেই। যদি অনেক দূরে কোথাও যাও তখন নম্বর নিয়ো। আমার নম্বর কাউকে দেই না। প্রয়োজন হলে আমি টেলিফোন করি।

আপনি টেলিফোন করলেই তো নম্বর উঠে যাবে।

আমারটা উঠবে না। আমার ক্ষেত্রে উঠবে Private Number, বুঝেছ?

জি।

আচ্ছা এখন যাও।

আমি চোখভর্তি পানি নিয়ে চলে এলাম। তখনই ঠিক করলাম পাশা খেলব। আইজ পাশা খেলব রে শ্যাম। যে আমার সঙ্গে দাবা খেলায় পারে না সে পাশা খেলাতেও পারবে না।

.

বড় মামার ঘরে দ্বিতীয় দফায় ভৌতিক আক্রমণ হলো চার দিন পরে। এবার মোস্তফা ভাই রক্ত এনে দেন নি। আমি ব্যবস্থা করেছি। এক বোতল রুহ আফজা ঢেলে নিয়েছি। এই

সিরাপ খুব ঘন। রক্তের মতো লাল। নাটকে-সিনেমায় রুহ্ আফজা রক্ত হিসেবে ব্যবহার করে।

এবার প্রথমবারের মতো হইচই হলো না। সবাই ঝিম মেরে গেল। শুধু আমার ছোট ভাই রুবেল তার গাড়ি নিয়ে ছোটাছুটি করতে করতে চেঁচাল–অক্ত, অক্ত, অক্ত। সে রক্ত বলতে পারে না। নাম জিজ্ঞেস করলে বলে, উবেল।

মামার ঘর বন্ধন দেওয়া হয়েছে। ঘরের চারকোনায় চারটা তাবিজ ঝুলছে। মা তার মহিলা পীরের কাছ থেকে মাটির সরায় কী সব লিখে এনেছেন। এই মাটির সরা রাখা হয়েছে বড় মামার বাথরুমে। মহিলা পীর বলেছেন, রক্ত-বিষয়ক কর্মকাণ্ড জ্বিনদের কারণে ঘটছে। কাজেই মাটির সরায় বাথরুম শুদ্ধি। জ্বিনরা নাকি বাথরুমে থাকতে পছন্দ করে।

জ্বিনের বিষয়ে অভিজ্ঞ একজন হুজুরকেও আনা হয়েছে। হুজুরের মুখভর্তি সাঈদীর মতো লাল দাড়ি। তাঁর গা থেকে সস্তা আতরের বিশ্রী গন্ধ আসছে। তিনি আবার জর্দা দিয়ে পান খান। আতরের গন্ধের সঙ্গে জর্দার গন্ধ মিলেমিশে ভয়ঙ্কর এক গন্ধ তৈরি হয়েছে। এই গন্ধেই জ্বিন-ভূতের পালিয়ে দেশান্তরি হওয়ার কথা।

হুজুর বড় মামার ঘরে পা দিয়েই বললেন, সর্বনাশ!

বড় মামা বললেন, সর্বনাশ কেন?

যে জিনিস এই ঘরে আশ্রয় নিয়েছে তার নাম গাইলান। গাইলান হলো জ্বিনদের জাদুকর। একে দূর করতে হলে আজান দিতে হবে।

বড় মামা বললেন, আজান দিতে হলে আজান দিন। আজান দিতে তো নিষেধ নাই।

হুজুর বললেন, এখন আজান দিয়ে লাভ নাই। গাইলান উপস্থিত নাই। আজান দিতে হবে তার উপস্থিতিতে।

বড় মামা বললেন, গাইলান গেছে কোথায়?

হুজুর বললেন, সেটা তো জনাব আপনাকে বলতে পারব না। গাইলান আমাকে তার ঠিকানা দিয়ে যায় নাই। তার মোবাইল নম্বরও আমার কাছে নাই।

বাবা বললেন, আমাদের করণীয় কী সেটা বলেন।

গাইলান দেখলেই আজান দিবেন। অজু করে পবিত্র হয়ে আজান দিবেন।

আমি বললাম, হুজুর, আজানের ক্যাসেট নিয়ে এসে সারা দিন এই ঘরে বাজালে কেমন হয়?

হুজুর কঠিন চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, মেয়েছেলের এইসব আলাপে থাকা ঠিক না। গাইলানের প্রধান দৃষ্টি থাকে মেয়েছেলের দিকে।

আমি হুজুরের সামনে থেকে চলে এলাম। রক্তের বদলে রুহ আফজা দেওয়ায় ভয়াবহ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা গেল। বড় মামার ঘর ভর্তি হয়ে গেল পিঁপড়ায়। সাধারণত কালো

পিঁপড়া যেখানে থাকে, সেখানে লাল পিঁপড়া থাকে না। বড় মামার ঘর ভর্তি হয়ে গেল সবধরনের পিঁপড়ায়।

বড় মামা হতাশ গলায় বললেন, এই ঘরের কী সমস্যা কিছুই তো বুঝতে পারছি না। গাইলান-ফাইলান সব ফালতু বাত।

বাবা বললেন, ঘটনা ঘটছে কীভাবে?

বড় মামা বললেন, তা জানি না। আমি পুলিশে খবর দিব। পুলিশ এসে গাইলানকে কানে ধরে নিয়ে যাবে।

কথা বলতে বলতে বড় মামা আমার দিকে তাকাচ্ছেন। আমাকে সন্দেহ করছেন না তো?

লিপি!

জি বড় মামা।

ঠিক করে বলো তো, পুরো ঘটনায় তোমার ভূমিকা কী?

আমি বললাম, মামা! আমার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বড় মামা বললেন, বলো শুনি। এটা কি কোনো প্রাকটিক্যাল জোক?

আমি বললাম, গাইলানের তরফ থেকে প্রাকটিক্যাল জোক হতে পারে। আমার তরফ থেকে না। আমি একজন দর্শক। সায়েন্সের ভাষায়–Ovserver.

বড় মামা বললেন, একটু আগে বলেছ তোমার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এখন কেন পিছিয়ে আসছ?

আমি বললাম, মামা, পিছিয়ে আসছি। Ovserver-এর গুরুত্ব অনেক বেশি। কোয়ান্টাম মেকানিক্স বলে Ovserver ছাড়া কোনো ঘটনাই ঘটবে না। আমার কথা বিশ্বাস না হলে আহসান চাচুকে জিজ্ঞেস করতে পারেন।

মামা কিছু না বলে কঠিন চোখে তাকিয়ে রইলেন। আমি নিজের ঘরে চলে গেলাম। সন্ধ্যাবেলা মোস্তফা ভাই উপস্থিত। তাকে একটা গরুর পায়ের রক্তমাখা হাড় আনতে বলেছিলাম। তিনি বড় পলিথিনের ব্যাগে করে হাড় নিয়ে এসেছেন। জায়গায় জায়গায় মাংস ও রক্ত লেগে আছে। আমি এক ফাঁকে সকিনার ঘরে মশারির ভেতর রেখে দিলাম। সকিনা তার ঘরে সারাক্ষণ মশারি টাঙিয়ে রাখে। ফুরসুত পেলেই মশারির ভেতর ঢুকে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে আসে। এবার যখন ঘুমুতে যাবে তখন খবর হয়ে যাবে।

আমি ভেবেছিলাম খবর হতে সময় লাগবে। রাত দশটা-এগারটা বেজে যাবে। তা হলো না। রাত আটটার দিকেই সকিনা ষাড়ের মতো চেঁচাতে লাগল। সকিনা বলছে, টাটকা মানুষ মাইরা তার পায়ের হাড্ডি আমার মশারির ভিতরে থুইছে। ও আল্লাগো! আমি কই যাব গো!

বড় মামা, বাবা এবং মা–এই তিনজনই মনে হলো অধিক শোকে পাথর হয়ে গেছেন। কারও মুখে কোনো কথা নেই।

আমিই প্রথম নীরবতা ভঙ্গ করে বললাম, আমার ধারণা গাইলান বড় মামার ঘরে শুরুতে ভর করেছিল, এখন ভর করেছে সকিনার ঘরে। মনে হয় গাইলান দুজনের ওপর কোনো কারণে অসন্তুষ্ট।

বড় মামা খড়খড়ে গলায় বললেন, গাইলান কি তোমাকে এই খবর দিয়ে গেছে?

আমি বললাম, না। এই থিওরি নিজে নিজে চিন্তা করে বের করেছি।

বড় মামা বললেন, থিওরি কপচানোর বয়স এবং অভিজ্ঞতা তোমার এখনো হয় নি। কাজেই চুপ করে থাকবে।

জি আচ্ছা মামা।

বড় মামা বাবার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে মার দিকে তাকালেন। গম্ভীর গলায় বললেন, গাইলান ফাঁইলান কিছু না। আমার বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র হচ্ছে। যে ষড়যন্ত্র করছে তার জানা উচিত যে আমি ফিডার খাওয়া লোক না। সব বের করে ফেলব। তদন্তের ভার দেব ডিবি পুলিশকে। আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু আছে ডিবির ইন্সপেক্টর। নাম খসরু। তাকে বললেই সে চব্বিশ ঘণ্টায় থলের বিড়াল বের করে তার গলায় ঘণ্টা বেঁধে দিবে।

মামা কঠিন মুখ করে ঘর থেকে বের হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। মনে হয় ডিবি ইন্সপেক্টর খসরু সাহেবের কাছে যাচ্ছেন। আমি বললাম, বড় মামা, আমরা কি হাড্ডিটা ফেলে দিব, না রেখে দিব ডিবি পুলিশের দেখার জন্যে?

বড় মামা জবাব দিলেন না।

রাতে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটল। আহসান সাহেব রাত দশটায় গিফট র‍্যাপে মোড়া একটা প্যাকেট পাঠালেন। সঙ্গে চিঠি। চিঠিতে লেখা–

Hello friend,
শুভ জন্মদিন। খুব দামি উপহার তোমাকে কখনো দিয়েছি বলে মনে করতে পারছি না। এবার দিলাম, কারণ তুমি ষোলতে পড়েছ। Sweet sixteen.
উপহারটা হচ্ছে, আমেরিকার অ্যাপল কোম্পানির wonder toy, ipad 2. এক হাজার গান আমি এই খেলনায় ঢুকিয়ে দিয়েছি। চিরায়ত সাহিত্যের বেশ কিছু বইও আছে। নানান ধরনের খেলা আছে।
এই অপূর্ব খেলনার উদ্ভাবকের নাম স্টিভ জবস। বেচারা এই খেলনা আবিষ্কারের পরপরই ক্যানসারে মারা যান।
এখন বলো তুমি কেমন আছ? মেয়েদের সবচেয়ে রহস্যময় বয়স হচ্ছে ষোল, এটা কি জানো? এই বয়সেই মেয়েরা সচেতনভাবে তার সঙ্গী খুঁজতে শুরু করে।
Who you looking
for What was his name
You can probably find him

At the grand chess game

চিঠির এইখানেই সমাপ্তি।

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটল রাত এগারটায়। বড় মামা মদ খেয়ে মাতাল অবস্থায় বাড়িতে ঢুকে বমি করে সব ভাসিয়ে দিলেন। যে বিকট গন্ধ বের হলো এতে গাইলান জ্বিন দৌড়ে পালিয়ে যেত। আমার অতি ভালো মা অনেক রাত জেগে নিজে সেই বমি পরিষ্কার করলেন।

সকিনাকে পরিষ্কার করতে বলা হয়েছিল। সে বলেছে, পুলাপানের বমি আমি পরিষ্কার করি। বুড়া মাইনষের বমি পরিষ্কার করি না। লাখ টেকা দিলেও না।

.

গত সাত দিনে আহসান সাহেবের সঙ্গে আমার দেখা হয় নি। তাঁকে টেলিফোনও করি নি। অষ্টম দিনে ছাদে তাঁর সঙ্গে দেখা হলো। আমি জানি উনি ছাদে হাঁটাহাঁটি করছেন। তারপরেও ভান করলাম–তাকে দেখতে পাই নি। ছাদে শুকাতে দেওয়া আচার আনতে গেছি। আমি যখন চলে আসছি তখন তিনি ডাকলেন, লিপি!

আমি ভয়ঙ্কর চমকে যাওয়ার ভাব করলাম। চমকানোর অভিনয় খুব ভালো হলো। কারণ চমকে আমি হাত থেকে আচারের বোতল ফেলে দিলাম। দুটা বোতলই ভেঙে চুরমার।

তিনি বললেন, সরি, তোমাকে চমকে দিয়েছি। পা কাটে নি তো?

আমি বললাম, মনে হয় কেটেছে। কিছু হবে না।

তিনি বললেন, কিছু হবে না মানে? দাঁড়াও, ডেটল নিয়ে আসছি।

উনি ডেটল আনতে ঢুকলেন, এই ফাঁকে আমি বাসায় চলে এলাম। কল্পনায় দেখছি, উনি ডেটল নিয়ে ফিরে এসে আমাকে না দেখে ধাক্কার মতো খেয়েছেন।

ব্যাকুল হয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন।

তিনি অনেক খেলা আমার সঙ্গে খেলেছেন।

আমি এখন তার খেলা তাঁকে ফেরত দিচ্ছি। আমাকে নিয়ে তার প্রধান এক খেলার কথা বলি। তিনি গাড়ি থেকে নামছেন, আমি স্কুলে যাচ্ছি। আমাকে দেখে বললেন, লিপি, স্কুল কখন ছুটি হবে?

আমি বললাম, চারটায়।

আমার সঙ্গে এক জায়গায় বেড়াতে যাবে?

আমার বুক ধক করে উঠল। আমি বললাম, অবশ্যই যাব।

তিনি বললেন, কোথায় যেতে চাও বলো।

আমি বললাম, আপনি যেখানে নিয়ে যাবেন আমি সেখানে যাব।

আমি যেখানে নিয়ে যাব সেখানে যাবে?

হুঁ।

সাভারের বাগানবাড়িতে যাবে? সেখানে প্রাকৃতিক পরিবেশে দাবা খেলা। রাজি আছ?

হুঁ।

রাতে যদি থেকে যেতে বলি থাকবে?

হুঁ।

তারপর বাবা-মার কাছে কী জবাব দিবে?

আমি বললাম, কিছু-একটা বলব, সেটা আপনার না জানলেও চলবে।

তিনি বললেন, তাহলে স্কুল ছুটির পর অপেক্ষা কোরো। আমি নিজে এসে তোমাকে নিয়ে যাব।

আমি বললাম, আচ্ছা।

স্কুলে কীভাবে আমার দিন কাটল আমি বলতে পারব না। প্রবল এক ঘোর। সারাক্ষণ মনে হচ্ছিল, এই বুঝি আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাব। অংক মিস বললেন, লিপি, তুমি এরকম করছ কেন? তোমার কি শরীর খারাপ করছে?

আমি বললাম, জি আপা।

তিনি বললেন, শরীর খারাপ নিয়ে ক্লাস করতে হবে না। বাসায় চলে যাও।

আমি বললাম, আপা! আমি এখন বাসায় যেতে পারব না। বাসায় এখন কেউ নাই। চারটার সময় আমাকে নিতে গাড়ি আসবে।

অংক মিস বললেন, তাহলে এক কাজ করো। কমনরুমে যাও। সোফায় শুয়ে থাকো। তোমাকে দেখে তো ভয় লাগছে, চোখ টকটকে লাল।

আমি কমনরুমের সোফায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুমের মধ্যেই নোংরা এক স্বপ্ন দেখলাম। আহসান সাহেব এবং আমি গাড়িতে করে যাচ্ছি। ড্রাইভার গাড়ি চালাচ্ছে। আমরা পেছনের সিটে। আমি তার কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছি। হঠাৎ তিনি বললেন...। না, এই স্বপ্নটা বলা যাবে না।

চারটায় স্কুল ছুটি হলো। আমি স্কুল গেটে দাঁড়িয়ে আছি তো আছিই। পাঁচটা বাজল, সাড়ে পাঁচটা বাজল। ছটার সময় আহসান সাহেবের গাড়ি নিয়ে বাবা উপস্থিত। বাবা বললেন, তুই এখানে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? স্কুল ছুটি হয়েছে। বাসায় যাবি না? তোর মা চিন্তায় অস্থির। তোর কী হয়েছে?

এই ঘটনার দুদিন পর আহসান সাহেবের সঙ্গে দেখা হলো। আমি এমন ভাব করলাম যেন কিছুই হয় নি। আহসান সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, লিপি, তোমার বয়স কত?

আমি বললাম, পনের।

তিনি বললেন, পনের বছর বয়েসী একটি মেয়ে কারও কথায় বেড়াতে চলে যাবে না। সে নিজেকে রক্ষা করবে। মনে থাকবে?

আমি বললাম, জি।

তিনি বললেন, ছাদে আজ টেলিস্কোপ ফিট করছি। মঙ্গল গ্রহ দেখা হবে। দেখতে চাও?

আমি বললাম, চাই।

মঙ্গল গ্রহের চাঁদ কয়টা বলো। তোমাকে আগে বলেছি।

দুটা।

নাম জানো?

না।

নাম শিখে রাখো। একটির নাম ডিমোস, আরেকটির নাম ফিবোস। মনে থাকবে?

থাকবে।

গুড গার্ল। তোমার বান্ধবী প্রতিমাকে খবর দাও। সেও দেখুক, আনন্দ পাবে। ড্রাইভারকে ঠিকানা দিয়ে পাঠিয়ে দাও।

আমি বললাম, যা দেখার আমি একা দেখব। কারও সঙ্গে শেয়ার করব না।

তিনি শব্দ করে হেসে উঠলেন। মনে হচ্ছে তিনি খুব মজা পেয়েছেন।

তিনি আমাকে যার ভেতর দিয়ে নিয়েছেন, আমি তাঁকেও সেই গোলকধাঁধার ভেতর দিয়ে নিয়ে যাব। আচারের বোতল আমার পায়ে পড়েছিল, কিন্তু পা কাটে নি। পা কাটার কথা বলেছি তাঁর রিঅ্যাকশান কী হয় তা দেখার জন্যে। তাঁর রিঅ্যাকশান দেখে খুশি হয়েছি।

ডেটল নিয়ে এসে আমাকে না দেখে তিনি কী করেছেন তা দেখতে পেলাম না। সামান্য আফসোস। সেই আফসোসও দূর হলো যখন বাবা বললেন, আচারের বোতল পড়ে তোমার নাকি পা কেটেছে?

আমি বললাম, হুঁ।

উনি তোমার জন্যে তুলা-ডেটল আনতে গেলেন, আর তুমি পালিয়ে চলে এলে? উনি টেনশন নিয়ে অপেক্ষা করছেন। এক্ষুনি যাও পা দেখিয়ে আসো।

আমি বললাম, যাব না।

বাবা বললেন, অবশ্যই যাবে। একজন কেউ মমতা দেখালে তার মূল্য দিতে হয়। এই বিষয়ে একটা সহি হাদিস আছে।

আমি বললাম, উনার কাছে যাচ্ছি। তোমাকে হাদিস কপচাতে হবে না।

আহসান সাহেব আমাকে দেখেই ক্ষুব্ধ গলায় বললেন, তুমি কোথায় পালিয়ে গেলে?

আমি বললাম, ভয়ে পালিয়ে গেছি।

কিসের ভয়?

ডেটল দিতে গিয়ে যদি আপনি আমার পায়ে হাত দেন সেই ভয়ে।

তিনি একটু থতমত খেলেন। আমি বললাম, বাসায় এসে দেখি পা কাটে নি। আচারের লাল তেল রক্তের মতো দেখাচ্ছিল।

তোমার জন্মদিন উপলক্ষে তোমাকে একটা গিফট পাঠিয়েছিলাম। গিফট দেখে খুশি হয়েছ? গিফট পছন্দ হয়েছে?

আমি বললাম, প্যাকেট খুলি নি তো। তাই জানি না কী গিফট।

প্যাকেট খোল নি কেন?

বাসায় অনেক ঝামেলা হচ্ছে তো, এইজন্যে খোলা হয় নি।

আহসান সাহেব বললেন, তোমাদের বাসার অবস্থা কী?

আমি বললাম, গাইলানের ভয়ে সবাই অস্থির।

গাইলান কী?

খারাপ ধরনের জ্বিন। জ্বিনদের জাদুকর। এই জ্বিন আজান দিয়ে তাড়াতে হয়। এমনিতে যায় না।

মনে হচ্ছে তোমার উপন্যাস লেখার প্লট পেয়ে গেছ?

হ্যাঁ। গাইলানের অংশটা লিখেছ?

না।

লিখছ না কেন?

আমার আর লিখতে ইচ্ছে করছে না।

উনি অবাক হয়ে বললেন, কেন ইচ্ছে করছে না?

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, আমার বাছুর প্রেম চলে গেছে তো, এইজন্যে।

তিনি বিস্মিত গলায় বললেন, বাছুর প্রেম শেষ?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

বাছুর প্রেম শেষ, লেখালেখিও শেষ?

হুঁ।

কীভাবে শেষ হলো?

জানি না কীভাবে শেষ হলো। হঠাৎ একদিন লক্ষ করলাম...। থাক বলব না।

বলবে না কেন?

শুনলে আপনার হয়তো খারাপ লাগতে পারে।

আমার খারাপ লাগবে না, তুমি বলো।

হঠাৎ একদিন লক্ষ করলাম, আপনার কাছে আসতে ইচ্ছে করে না, আপনার সঙ্গে কথা বলতেও ভালো লাগে না।

তুমি বলতে চাচ্ছ হঠাৎ লক্ষ করলে আমি একজন বিরক্তিকর মানুষ হয়ে গেছি?

জি।

আচ্ছা। ইন্টারেস্টিং! তোমার বিয়ের কী হলো? ঐ যে দর্জি। আলাপ আলোচনা চলছে?

জানি না। আমি নিজ থেকে তো আর বাবাকে জিজ্ঞেস করতে পারি না, বাবা, আমার বিয়ের আলাপের কতদূর কী হলো।

আহসান সাহেব কিছু বললেন না, চুপ করে রইলেন। সিগারেটের প্যাকেট হাতে নিলেন। তিনি সিগারেট খুব কম খেতেন। ইদানীং কি সিগারেট খাওয়া বেড়েছে? সবসময় তাঁর হাতে সিগারেটের প্যাকেট।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। স্পষ্ট গলায় বললাম, চাচা যাই?

তিনি সিগারেট ধরিয়েছেন। ধোয়া ছেড়ে ধোয়ার দিকে তাকিয়ে আছেন। কিছু বলবেন বলে ঠোঁট ফাঁক করলেন, কিছু বললেন না। আমি চলে এলাম। আমার চাচা ডাক নিশ্চয়ই তাঁর মরমে বিধেছে।

আমি তাঁর খেলাই তাঁকে ফেরত পাঠাচ্ছি।
What you looking for
What was her name
You can probably find her
At the grand chess game

মামা ঠিক করেছেন এই বাড়িতে থাকবেন না। তিনি কলাবাগানের এক হোটেলের সঙ্গে মাসকাবারি ব্যবস্থা করেছেন। হোটেলের নাম ব্লু হাউস।

মা কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, ভাইজান, সত্যি চলে যাবেন?

বড় মামা বললেন, এখনই তো যাচ্ছি না। বুধবার যাব। বুধবার থেকে হোটেল বুকিং নিয়েছি। মাঝে মধ্যে এসে এক দুই রাত থাকব।

মাঝে মধ্যে এসে এক দুই রাত থাকব বলার সময় চট করে মামা একবার সকিনার দিকে তাকালেন। বিষয়টা অন্য কেউ লক্ষ করল না। লক্ষ করার কথাও না। আমি লক্ষ করলাম।

বাবা বললেন, জিনিসপত্র কি সব নিয়ে যাবেন ভাইজান?

প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে যাব। বাকি সব থাকবে। বড় ট্রাংকটা নিয়ে যাব। সেখানে কিছু জরুরি কাগজপত্র আছে।

বড় মামা জানেন না ট্রাংকে তাঁর প্রয়োজনীয় কাগজপত্র কিছুই নেই। সব আমি সরিয়ে ফেলেছি। চাবিওয়ালা বড় ট্রাংকের চাবি বানিয়ে দিয়েছে। সেই চাবি আমার পড়ার ড্রয়ারে লুকানো।

ট্রাংকে আমি একটা দলিল দেখে আনন্দ পেয়েছি। এক শ টাকার স্ট্যাম্পে মা লিখেছেন, জমিতে মায়ের যে অংশ তা তিনি বড় মামাকে লিখে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই বড় মামা মাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে এই দলিল করিয়েছেন। মা এত বোকা কেন বুঝলাম না। সাধারণত দেখা যায়, স্ত্রী বোকা হলে স্বামী চালাক হয়। আমার বাবা-মা দুজনই বোকা। বাবা বোকা হয়েছেন মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়ে। তাঁর চিন্তা চেতনায় মুক্তিযুদ্ধের বাইরে কিছু নেই। তিনি যতটা বোকা তাঁর স্ত্রী ঠিক ততটাই বোকা। তাদের নিয়ে একটা উপন্যাস লিখলে নাম হতো বোকাবুকির সংসার।

বড় মামার দশতলা দালানের ব্যাপারটা এখন স্পষ্ট হয়েছে। ট্রাংকের বাকি কাগজ এখনো দেখা হয় নি। ধীরে ধীরে দেখব। তাড়াহুড়ার কিছু নেই। যখন জানবেন তখন কী নাটক হয় কে জানে! নাটকটা দেখতে ইচ্ছে করছে। মার কাছে বড় মামা ও সকিনার বিষয়টা বলতে চাচ্ছি। আমি সকিনাকে ভোররাতে মামার ঘর থেকে বের হতে দেখেছি।

মা আমার মুখের কথা বিশ্বাস করবে না। সবচেয়ে ভালো হয় সকিনা যখন মামার ঘরে তখন হঠাৎ বাইরে থেকে দরজায় তালা দিয়ে দেওয়া।

বড় মামা বুধবারে চলে যাবেন। আজ রবিবার। হাতে দুদিন মাত্র আছে। এই দুদিনের ভেতর কি ঘটনা ঘটবে? হে আল্লাহপাক, যেন ঘটে।

.

আহসান সাহেব আমার ওপর প্রচণ্ড রেগে আছেন। কয়েকবার খবর পাঠিয়েছেন যেন আমি দেখা করি। আমি দেখা করি নি। এই কিছুক্ষণ আগে বাবাকে দিয়ে স্লিপ পাঠিয়েছেন। মুখবন্ধ খাম বাবা আমার হাতে দিয়ে বললেন, আহসান তোমাকে দিতে বলল। খাম খুলে দেখি ইংরেজিতে লেখা– need to talk to you.

বাবা চিন্তিত গলায় বললেন, কী লেখা?

আমি বললাম, আমার সঙ্গে কথা বলতে চান।

বাবা বললেন, যাও কথা বলে আসো। না গেলে রাগ করবে। আহসানের মেজাজ কী কারণে জানি খুব খারাপ।

তোমাকে অপমান করেছেন, তাই না?

তুমি কীভাবে জানলে?

অনুমান করছি।

বাবা বললেন, তোমার অনেক বুদ্ধি। অনুমান ঠিক আছে।

আমি বললাম, তিনি সবার সামনে তোমাকে ইডিয়ট বলেছেন। তাই না?

বাবা ক্ষীণ গলায় বললেন, সবার সামনে না। ক্যাশিয়ার সাহেবের সামনে। ইডিয়টও বলে নাই। বলেছে বেয়াকুফ।

তুমি কী বললে?

আমি আবার কী বলব? আমি তো আর তাকে বেয়াকুফ বলতে পারি না। তবে মনে কষ্ট পেয়েছি।

আমি বললাম, বাবা, চাকরিটা ছেড়ে দিলে হয় না?

বাবা চমকে উঠলেন। আমি বললাম, তিনিই তোমাকে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দেবেন। কাজেই আগেভাগেই চাকরি ছেড়ে দেওয়া ভালো।

বাবা বললেন, চাকরি ছেড়ে দিলে থাকব কোথায়?

আমি বললাম, রাস্তায় থাকব। হিমু-পরিবার হয়ে যাব।

বাবা বললেন, হিমু-পরিবার আবার কী?

যে পরিবারের সব সদস্য শুধু পথে পথে হাঁটে, সেই পরিবারকে বলা হয় হিমু পরিবার।

বাবা হতাশ গলায় বললেন, তোমার কথা আগেও বুঝতে পারতাম না, এখনো পারি না।

আমি বললাম, তুমি যদি রবীন্দ্রনাথ হতে তাহলে এখন বলতে, তোমার ভাষা বোঝার আশা দিয়েছি জলাঞ্জলি।

বাবার সবকিছু জলাঞ্জলির সময়ে এসে গেছে, তিনি বুঝতে পারছেন না।

.

আহসান সাহেব আমার সঙ্গে কথা বলতে চান। লিখে পাঠিয়েছেন—I need to talk to you. পরপর দুটা to, বাজে ইংলিশ। I need to talk লিখলেই হতো। কথা শোনার জন্যে আমি আহসান সাহেবের কাছে গেলাম না। স্লিপের উত্তর স্লিপ দিয়ে দিতে হয়, কাজেই আমিও একটা স্লিপ লিখে সকিনাকে দিয়ে পাঠালাম। সেখানে লেখা–

“রাত্রিমখ নাফনা
কুরেৎ সি ঝিনা। ৫৩০১ ফ্রেং।”

সাংকেতিক কোনো চিঠি না। হাবিজাবি লেখা, কিন্তু তিনি ভাববেন সাংকেতিক চিঠি। অর্থ উদ্ধারের চেষ্টা চালাবেন। অর্থ উদ্ধার করতে পারবেন না। অতিবুদ্ধিমান হওয়ার কারণে হালও ছাড়বেন না। বিপদে অতিবুদ্ধিমানরাই পড়ে। সাধারণরা পড়ে না।

মামা অতিবুদ্ধিমান বলেই বিপদে পড়বেন। শিং মাছ যেমন ছাই দিয়ে ধরা হয়, মামাকেও আমি ছাই দিয়ে ধরব। ধরব বলা ঠিক হবে না, ধরে ফেলেছি। পরিকল্পনা তৈরি হয়েছে। পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কে সাহায্য করবে? কে আবার? বোকা সকিনা।

সকিনা রে সখিনা।
তোর রঙ্গ দেখে বাঁচি না।

ধুর! ভুল বললাম, রঙ্গ সকিনার না–রঙ্গ আমার মামার। তার রঙ্গ দেখে আমি বাঁচি না। রঙ্গ অবশ্যি আহসান সাহেবও দেখাচ্ছেন। এবং আরও দেখাবেন।

আহসান সাহেবের সাম্প্রতিক রঙ্গের একটি ঘটনা বলি।

চারটার সময় স্কুল ছুটি হয়েছে, আমি প্রতিমার সঙ্গে গেট দিয়ে বের হয়ে দেখি আহসান সাহেবের ড্রাইভার। সে বলল, স্যার, আপনাকে নিতে এসেছেন। গাড়িতে বসে আছেন।

আমি গাড়ির কাছে গেলাম।

আহসান সাহেব বললেন, সাভারের বাগানবাড়িতে সেনচুরিয়ান গাছে ফুল ফুটেছে। অসাধারণ দৃশ্য। দেখতে যাবে?

আমি কিছু বলার আগেই প্রতিমা বলল, আমি যাব। কাকু, আমি যাব।

আমি বললাম, আপনি প্রতিমাকে নিয়ে যান। প্রতিমা ফুল খুব পছন্দ করে।

আহসান সাহেব বললেন, তুমি যাবে না?

আমি বললাম, না। আমি ফুল পছন্দ করি না।

বলেই বাসার দিকে হাঁটা শুরু করলাম। আহসান সাহেব ডাকলেন, লিপি। এই লিপি।

আমি ফিরেও তাকালাম না।

সন্ধ্যার পরপর আহসান সাহেব আমাদের বাসায় উপস্থিত। এই কাজ তিনি কখনো করেন না। বাবার সঙ্গে তার নাকি জরুরি আলাপ। আমি সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেললাম তিনি কী জন্যে এসেছেন। তিনি বাবার সঙ্গে কথা বলতে আসেন নি। তিনি আমার সঙ্গে কথা বলবেন, মাধ্যম হলেন বাবা। তিনি ধরে নিয়েছেন তাদের কথাবার্তা আমি আড়াল থেকে শুনব।

অন্যের কথা আড়াল থেকে শোনা অপরাধ, শুধু লেখকদের ক্ষেত্রে এটা অপরাধ না। কথাটা মার্কিন লেখক মার্ক টুয়েনের। আমাকে বলেছেন আহসান সাহেব। লেখকদের প্রধান কাজ

শুনে যাওয়া। প্রকাশ্য কথা অপ্রকাশ্য কথা–সব শোনা। আমি তা-ই করলাম। তাদের কথাবার্তার সময় জানালার পাশে দাঁড়িয়ে রইলাম।

আহসান সাহেব : আজ সকালের ঘটনাটার জন্য আমি লজ্জিত। টেনশনে আছি তো, টেনশনে মাথা এলোমেলো হয়ে আছে।

বাবা : কোন ঘটনার কথা বলছ?

আহসান : তোমাকে বেয়াকুফ বলেছি।

বাবা : বেয়াকুফকে বেয়াকুফ বলার মধ্যে দোষের কিছু না। মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের কমান্ডার আমাকে সব সময় বলতেন বুরবাক। আচ্ছা ওই প্রসঙ্গ থাক। তোমার টেনশন কী নিয়ে সেটা বলো।

আহসান : বিয়ে করব কি করব না, এই নিয়ে টেনশন। তুমি তো জানো, আমার আগের বিয়েটা ওয়ার্ক আউট করে নি। যার প্রথম বিয়ে ওয়ার্ক আউট করে না, তার দ্বিতীয়টাও করে না। তবে তৃতীয়টা করে।

বাবা : জানতাম না তো!

আহসান : এই স্ট্যাটিসটিকস আমেরিকানরা বের করেছে। তিন বিয়ে চার বিয়ে তো ওদের কাছে ডালভাত। ইছামতি উপন্যাসে বিভূতিভূষণ এক যুবককে তিন বোনের সঙ্গে বিয়ে

দিয়েছিলেন এবং যুবক অসম্ভব সুখী হয়েছিল। এই গল্পটি আহসান সাহেব আমাকে শোনানোর জন্য বলেছেন। তিনি ইছামতি উপন্যাসটা আমাকে পড়তে দিয়েছিলেন।

বাবা : তিন বোন বিয়ে করে সুখী? ভালো তো। হা হা হা।

[বাবা অকারণে হাসছেন। হাসির কিছু ঘটে নি। তিনি হাসছেন প্রমাণ করার জন্যে যে, আহসান সাহেবের কথা শুনে তিনি মজা পাচ্ছেন। ঘরজামাই যেমন শ্বশুরের মান রেখে চলে, একজন আশ্রিতও আশ্রয়দাতার মান রেখে চলে।]

বাবা : আমার মতে তোমার উচিত একটা ভালো মেয়ে দেখে বিয়ে করা। শেষ বয়সে সেবাযত্নের প্রয়োজন আছে।

আহসান : আমার সেবাযত্নের জন্যে স্ত্রী প্রয়োজন নেই। আমার কাছে স্ত্রী হলো কম্পেনিয়ন। সাথী।

বাবা : ও আচ্ছা সাথী। অবশ্যই সাথী।

[বাবা জ্ঞানীর মতো মাথা ঝাঁকাচ্ছেন, যেন সাথী বিষয়টা তিনি বুঝে ফেলেছেন।]

আহসান : ডাকাতের সঙ্গে তার যে বন্ধু ডাকাতি করতে যাচ্ছে সেও কিন্তু ডাকাতের সাথী।

বাবা : আরে তাই তো! Valid Point। বিষয়টা সেইভাবে আগে চিন্তা করি নাই। তুমি বলায় সব ক্লিয়ার হয়ে গেল।

[বাবার কাছে কিছুই ক্লিয়ার হয় নি। সব জট পাকিয়ে আছে। বন্ধুকে খুশি করার চেষ্টায় আছেন।]

আহসান : এক কাপ চা খাব। লিপিকে চা দিতে বলো। চায়ে আমি কতটুকু চিনি খাই লিপি জানে।

আহসান সাহেব ভেবেছিলেন চা নিয়ে আমি ঢুকব। তিনি এই ঘটনার জন্যে অপেক্ষা করছেন। যন্ত্রণাদায়ক অপেক্ষা। এই ধরনের অপেক্ষার ভেতর দিয়ে আমি নিজেও গিয়েছি। আমার সব অপেক্ষা শেষ হয়েছে অবহেলায়। আমি চা বানিয়ে সকিনাকে দিয়ে পাঠালাম।

আহসান সাহেব চলে যাওয়ার পর বাবা আনন্দিত গলায় জানালেন, রাতে আহসান আজ আমাদের সঙ্গে খাবে। তার বাবুর্চি আসে নি।

আমি বাবাকে বললাম, খেতে এসে তিনি যদি আমার খোঁজ করেন তাহলে বলবে, আমি শুয়ে আছি। আমার জ্বর।

বাবা কপালে হাত দিয়ে বললেন, কপাল তো ঠান্ডা।

আমি বললাম, কিছু কিছু জ্বর চামড়ার ভেতরে থাকে। গায়ে হাত দিয়ে সেই জ্বর বোঝা যায় না।

বাবা বললেন, এই অদ্ভুত কথা তোমাকে কে বলেছে?

আমি বললাম, আহসান চাচু বলেছেন।

বাবা বললেন, তাহলে ঠিক আছে। তাকে আমি চিনি তো, সে ভুল কথা বলার মানুষই না।

আমি বললাম, উনি ভুল কথা বলার মানুষ না?

বাবা বললেন, No never.

আমি বললাম, তোমার বন্ধু তাহলে মহাজ্ঞানী?

বাবা বললেন, Yes.

তিনি উত্তেজিত হয়ে গেলে ইংরেজি বলেন। বেশির ভাগ সময় ভুলভাল ইংরেজি। একবার আমার ওপর রাগ করে বলেছিলেন, You girl very naughty.

আমি বললাম, ভুল ইংরেজি বলবে না বাবা।

বাবা প্রচণ্ড রেগে গিয়ে বললেন, কোথায় ভুল করলাম? ইংরেজির প্রফেসর এসেছে! আমাকে ইংরেজি শেখায়! থাপড়ানো দরকার।

উত্তেজনায় বাবার ইংরেজি আরও জড়িয়ে গেল। তিনি ক্রমাগত বলতে লাগলেন, 1 drop window you. এর অর্থ তিনি আমাকে জানালা দিয়ে ফেলে দেবেন।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, বাবার ভুলভাল ইংরেজি শুনতে আমার ভালো লাগে। এই অদ্ভুত মানসিকতার কারণ কী কে জানে! আহসান সাহেবকে জিজ্ঞেস করা যায়। উনি নিশ্চয় জানেন।

একটা সময় আসবে যখন আমি উনার মতোই জানব। শব্দ খেলায় প্রতিবার উনাকে হারাব। শব্দ খেলাটা হচ্ছে–শব্দের মানে বলা। ডিকশনারি দেখে উনি আমাকে পাঁচটা শব্দের মানে জিজ্ঞেস করবেন। প্রতিটি ঠিক উত্তরের জন্যে আমি এক পয়েন্ট করে পাব।

তারপর আমার পালা। আমি ডিকশনারি দেখে তাঁকে পাঁচটা প্রশ্ন করব।

আহসান সাহেব বলেছিলেন বাংলায় অনেক শব্দ আছে যা শুধু ডিকশনারিতে পাওয়া যায় বাস্তবে ব্যবহার নেই। যেমন,

দুশ্চর : যেখানে যাওয়া দুঃসাধ্য।
দৃষ্টরজা : প্রাপ্ত যৌবনা। যেমন, তুমি।

এই বলেই তিনি খুবই লজ্জা পেয়ে গেলেন। তাঁর লজ্জা দেখে আমি পেলাম আনন্দ।

৬. প্রতিমাকে নিয়ে সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে

প্রতিমাকে নিয়ে আমি সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে এসেছি। ওয়েটিং রুমে বসে আছি। প্রতিমা আমাকে বলেছে, আমি এমন সব কথা বলব যে সাইকিয়াট্রিস্টের মাথা ভনভন করে ঘুরবে।

আমি বললাম, তাতে লাভ কী?

কাউকে ভড়কে দিতে পারলে আমার ভালো লাগে, এইটাই লাভ। আমি তোর আহসান সাহেবকে কী পরিমাণ ভড়কে দিয়েছি এটা জানিস?

না।

তোর মনে নাই তোকে উনি সাভারে নিতে চাইলেন? তুই রাজি হলি না, গটগট করে চলে গেলি। আর আমি উনার গাড়িতে উঠে বসলাম। আমার এক কথা–চাচা, আমি সাভার যাব। আমাকে নিয়ে যেতেই হবে।

আমি শুরু করলাম কান্না। উনি পড়লেন মহাবিপদে। গাড়ির চারপাশে লোক জমে গেল। সবাই জানতে চায় ঘটনা কী?

তারপর?

তারপর কী হলো বলব না। তুই তোর আহসান সাহেবের কাছে জেনে নিস। তবে এই লোক কিন্তু ভালো। একজন ভালো মানুষকে খারাপ বানানো খুব শক্ত।

খারাপ বানানোর চেষ্টা করেছিলি?

হুঁ।

কীভাবে চেষ্টা করলি?

বলব না।

তুই এরকম কেন?

প্রতিমা হাসতে হাসতে বলল, জানি না কেন? সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যাচ্ছি, উনি হয়তো বলতে পারবেন আমি এরকম কেন।

আমি বললাম, সাইকিয়াট্রিস্টকে ভড়কে দেওয়ার চেষ্টা না করে চিকিৎসা নিয়ে তুই ঠিক হয়ে যা।

প্রতিমা বলল, আমি ঠিক হব না। যা আছি তারচেয়ে আরও খারাপ হব। একসময় পাগল হয়ে যাব। পাগল হয়ে গুলিস্তানে লাঠি হাতে ট্রাফিক কনট্রোল করব।

এই বলেই প্রতিমা উঠে দাঁড়াল। কঠিন গলায় বলল, সাইকিয়াট্রিস্ট দেখাব। চল বাসায় যাই।

দেখাবি না কেন?

প্রতিমা বলল, সাইকিয়াট্রিস্ট যা জানে আমি তারচেয়ে বেশি জানি এইজন্যে দেখাব না। আমার কথা কি তোর বিশ্বাস হয়?

হয়।

আমরা সাইকিয়াট্রিস্টের ঘর থেকে বের হয়ে রিকশায় উঠতে যাব, হঠাৎ দেখি আহসান সাহেবের গাড়ি। তিনি আমাদের জন্যে গাড়ি পাঠিয়েছেন। আমি যে প্রতিমাকে নিয়ে সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে আসব তা তাঁকে জানাই নি। আমার মনে হয় উনার সাইকিয়াট্রিস্ট বন্ধু জানিয়েছেন।

আমরা দুই বন্ধু তাঁর গাড়িতে উঠে অনেক রাত পর্যন্ত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ালাম। প্রতিমা সারাক্ষণই আমার ঘাড়ে মাথা রেখে কাঁদল। কেন কাঁদল আমি জানি না।

৭. বড় মামা হোটেলে চলে যাবেন

আজ বুধবার। বড় মামা হোটেলে চলে যাবেন। তার সঙ্গে কী সব যাবে তা আলাদা করা হচ্ছে। মামা ট্রাংক এত হালকা কেন দেখার জন্য তালা খুলেছেন। ট্রাঙ্ক খুলে তার জবান বন্ধের মতো হয়ে গেল। শূন্যট্রাংকে সকিনার এক জোড়া স্যান্ডেল এবং মামার টেবিলের ড্রয়ারে রাখা কনডমের প্যাকেট। এই যা, কিসের প্যাকেট বলে ফেলেছি। সরি।

মামা প্রথমেই আমাকে ডেকে পাঠালেন। থমথমে গলায় বললেন, আমার ট্রাংক কে খুলেছে?

আমি বললাম, তোমার ঘর তালা দেওয়া, ট্রাংক তালা দেওয়া। চাবি তোমার কাছে। কে খুলবে?

মামা বললেন, জরুরি সব কাগজপত্র, জমির দলিল ছিল ট্রাংকে, কিছুই নেই–আছে এক জোড়া স্যান্ডেল।

কার স্যান্ডেল মামা?

কার স্যান্ডেল আমি জানব কীভাবে? এই যে স্যান্ডেল।

আমি বললাম, মনে হচ্ছে সকিনার স্যান্ডেল। ওকে ডেকে জিজ্ঞেস করি?

মামা মূর্তির মুখ করে বসে রইলেন। সকিনা এসে স্যান্ডেল শনাক্ত করল। তার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত। সে বলল, আপনার এইখানে স্যান্ডেল! আমি কয়দিন ধইরা খুঁজতেছি।

মামা বললেন, তুই আমার ট্রাংকে তোর স্যান্ডেল রেখেছিস?

সকিনা বলল, তুই তুকারি করেন ক্যান?

মামা বললেন, থাবড়ায়ে তোর দাঁত ফেলে দেব হারামজাদি। তুই আমার ট্রাংক খুলেছিস?

সকিনা বলল, হারামজাদি ডাকা শুরু করছেন। রাইতে যখন ঘরে ডাইকা মহব্বত করেন, তখন হারামজাদি ডাক কই ছিল?

মামা বললেন, মাগি চুপ!

সকিনা বড় মামার গালে ঠাস করে চড় বসিয়ে দিল। অকল্পনীয় দৃশ্য। আমি ছুটে ঘর থেকে বের হলাম। মাকে বললাম, ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটছে মা। গাইলান চলে এসেছে। বাবাকে আজান দিতে বলো।

কী বলছিস তুই!

আমি বললাম, গাইলান সকিনার ওপর ভর করছে। এই কারণে সকিনা বড় মামার গালে চড় দিয়েছে। একটু আগে দেখেছি সকিনা হাতে স্যান্ডেল নিয়েছে, মনে হয় বড় মামাকে স্যান্ডেল দিয়ে মারবে।

ঘটনা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। সকিনা ক্রমাগত চেঁচাচ্ছে। আমারে বিয়া করণ লাগব। বিয়া না করলে আমি ছাড়ুম না। পত্রিকায় নিউজ দিমু। বলুম, আমার পেটে সন্তান। আমি গফরগাঁয়ের মেয়ে। আমারে চিনে না। আফনেরে মামা ডাকি। মামা এমুন হয়?

মা কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, সকিনা, এইসব কী বলছিস!

সকিনা বলল, আফনের ভাইজানেরে জিগান কী বলতেছি। যদি প্রমাণ হয় আমি মিথ্যা বলেছি, তাইলে আমি মামার কাঁচা গু খামু।

বড় মামা বললেন, তুই এক্ষুনি বের হ। বেশ্যা মাগি। মানুষকে বিপদে ফেলে ব্ল্যাকমেইলের চেষ্টা। যা তুই পত্রিকাওয়ালাদের খবর দে!

সকিনা স্যান্ডেল নিয়ে ঝড়ের বেগে বের হয়ে গেল। পরিস্থিতি সঙ্গে সঙ্গে ঠান্ডা হওয়ার কথা। তা হলো না। বড় মামা বললেন, আমার বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র হচ্ছে। আমি শিশি খাওয়া পাবলিক না। আমি বুঝি।

বাবা বললেন, কী ষড়যন্ত্র? কে করছে?

বড় মামা বললেন, ষড়যন্ত্র করছে তোমার মেয়ে। আমার ঘরে রক্ত ফেলে রাখা, সকিনার স্যান্ডেল ট্রাংকে ভরে রাখা–সব তার কাজ। আমার জমির দলিল চুরি করা হয়েছে। এই বাড়ি আমি তন্নতন্ন করে খুঁজব।

বাবা বললেন, অবশ্যই খুঁজবেন। আপনার সঙ্গে আমিও খুঁজব। জমির দলিল হারানো সহজ কথা! ছিঃ ছিঃ কী কেলেঙ্কারি!

বাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজেও দলিলপত্রের কোনো হদিস পাওয়া গেল না। বড় মামা বললেন, কাগজপত্র কোথায় আছে আমি জানি।

বাবা বললেন, কোথায়?

বড় মামা বললেন, তোমার মেয়ে কাগজপত্র রেখেছে বাড়িওয়ালা আহসান সাহেবের কাছে।

বাবা বললেন, তার কাছে কাগজ রাখবে কেন?

বড় মামা বললেন, আমি শিশি খাওয়া লোক না। আমি সব বুঝি।

মা বললেন, কী বুঝেন?

বড় মামা বললেন, তোমার এই মেয়ে আহসান সাহেবের রক্ষিতা। আহসান সাহেব এই মেয়ের জন্যে ঘর খামাখা সাজায়ে দেন? ফ্রি লাঞ্চ বলে জগতে কিছু আছে? জেনেশুনে মেয়েকে দিয়ে বেশ্যাবৃত্তি। ছিঃ ছিঃ!

কথাবার্তার এই পর্যায়ে মা মাথা ঘুরে মেঝেতে পড়ে গেলেন।

হতভম্ব বাবা, বড় মামার দিকে তাকিয়ে আছেন। মা যে মাথা ঘুরে পড়ে গেছেন সেদিকে তার লক্ষও নেই।

ঘরে আমি আর মা। অনেক কষ্টে মাকে বিছানায় তুলেছি। বাবা এবং বড় মামা ব্যস্ত দ্বিতীয় দফা জমির দলিল অনুসন্ধানে। এখন আমার রুমে অনুসন্ধান চলছে। বড় মামা বেতের চেয়ারে বসে আছেন, বাবা খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

সকিনা আবার ফিরে এসেছে। বাড়ির সামনে রাস্তার ওপাশে দাঁড়িয়ে দুনিয়ার নোংরা কথা বলে যাচ্ছে। প্রতিমা শুনলে খুব মজা পেত। সকিনাকে ঘিরে জনতার যে অংশ দাঁড়িয়েছে তারা খুবই মজা পাচ্ছে। অনেকেই দেখি মোবাইল ফোন উঁচু করে সকিনার ভিডিও করছে। তাকে ঘিরে ভিড় যেভাবে বাড়ছে তাতে মনে হয় কিছুক্ষণের মধ্যে ট্রাফিক জ্যাম লেগে যাবে। সকিনার কথাবার্তার কিছু নমুনা।

ওই মামা। তুই আমারে কী করছস? সব পাবলিকরে বলব। পাবলিক তুরে কাঁচা খাইয়া ফেলব। টান দিয়া তোর ... ছিঁড়ব। তখন কী করবি? কারে ...?

.

মা কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, কী হচ্ছে রে?

আমি বললাম, নাটক হচ্ছে। এই নাটকে আমরা যার যার অংশে অভিনয় করে যাচ্ছি। তোমার ভূমিকা হলো মৃত সৈনিকের। তুমি চুপচাপ শুয়ে থাকো।

মা বিড়বিড় করে কী যেন বললেন। আমি বললাম, সত্যি কথা বলো তো, তুমি বড় মামাকে বাড়ির ওয়ারিশ ছেড়ে দিয়েছ, এমন দলিল কেন করলে? মহৎ সাজার জন্যে? মা, আমরা কেউ মহৎ না।

মা বললেন, ওই দলিলের কথা তুই জানলি কীভাবে? তোকে কে বলেছে?

আমি বললাম, জ্বিন গাইলান এসে বলে গেছে মা।

মা বললেন, তোর মামার ট্রাংক তুই খুলেছিস?

না। গাইলান খুলেছে। ওই প্রসঙ্গ থাক, তুমি রেস্ট নাও।

.

অনুসন্ধান পর্ব সমাপ্ত। বাবা ক্লান্ত শুকনা মুখে চেয়ারে বসে আছেন। বড় মামা বললেন, আমি আহসান বদটার ঘর পরীক্ষা করব। আমি ছাড়ব না। তোমরা চলো আমার সাথে। তোমাদের সামনে মোকাবেলা হবে। লুকাছাপার মধ্যে আমি নাই। লিপি! তুইও চল আমাদের সঙ্গে।

আমি, বাবা আর বড় মামা আহসান সাহেবের ঘরে উপস্থিত হলাম। বাবা ক্রমাগত চোখের পানি মুছছেন। বড় মামার চোখমুখ শক্ত। শুধু আমি শান্ত। আহসান সাহেব অবাক হয়ে বললেন, কী ব্যাপার?

বড় মামা বললেন, আমার কিছু জরুরি কাগজপত্র চুরি হয়েছে। আমার ভাগ্নি লিপি চুরি করেছে। সে লুকিয়ে রেখেছে আপনার এখানে। কাগজপত্রগুলো না পেলে আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে।

আহসান সাহেব শান্ত স্বরে বললেন, লিপি কি বলেছে যে আমার এখানে লুকিয়ে রেখেছে?

বড় মামা বললেন, এখনো স্বীকার করে নি। তবে তার ভাবভঙ্গি এ রকম।

আহসান সাহেব বললেন, অবশ্যই খুঁজে দেখবেন। আমার দিক থেকে কোনো সমস্যা নেই। তবে আমি লিপির সঙ্গে আলাদা কথা বলে জানতে চেষ্টা করি, সে আমার এখানে রেখেছে কি না।

বড় মামা বললেন, জিজ্ঞাস করেন। আমি এখানেই থাকব। আপনার ঘর পরীক্ষা না করে যাব না।

আহসান সাহেব বললেন, অবশ্যই।

আমি এবং আহসান সাহেব ছাদের এক কোনায় এসে দাঁড়িয়েছি। আহসান সাহেবের মুখ হাসি হাসি। হাসি সংক্রামক, কাজেই আমিও হাসলাম। আহসান বললেন, কাগজপত্র চুরি করেছ?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

আমার এখানে রেখেছ?

না।

কোথায় রেখেছ?

লেখক হুমায়ুন স্যারের বাসায়। সেখানে মোস্তফা নামের আমার পরিচিত একজন আছে। হুমায়ূন স্যারের পিওন। তাকে রাখতে দিয়েছি।

আহসান সাহেব বললেন, ভেরি স্মার্ট।

আমি বললাম, আপনাকে যে সাংকেতিক চিঠি পাঠিয়েছি তার অর্থ উদ্ধার করতে পেরেছেন?

তিনি বললেন, তুমি কোনো সাংকেতিক চিঠি পাঠাও নি। এলোমেলো কিছু কথা লিখে আমাকে বিভ্রান্ত করতে চেয়েছ।

বিভ্রান্ত হয়েছেন?

আমি বিভ্রান্ত হওয়ার মানুষ না। তোমার বাবা কাঁদছেন কেন?

মনের দুঃখে কাঁদছেন। বড় মামা আমাকে বলেছেন আমি নাকি আপনার রক্ষিতা।

Oh God!

আমি এখন এমন এক কথা বলব যে আপনি আবারও বলবেন, Oh God.

সেটা কী কথা?

আপনার রক্ষিতা হতে আমার কোনো আপত্তি নেই।

আহসান সাহেব Oh God বললেন না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্যেই হয়তো বললেন, তোমাদের কাজের মেয়েটা রাস্তায় দাঁড়িয়ে কুৎসিত সব কথা বলে যাচ্ছে।

আমি বললাম, যা বলছে সবই সত্য।

সত্যি হলেও নোংরা কথা এইভাবে বলা ঠিক না। যে-কোনোভাবেই হোক বন্ধ করা প্রয়োজন।

আমি বললাম, আমি চাই সকিনা নোংরা কথা বলতে থাকুক। সবাই জানুক। আমি আপনাকে না জানিয়ে একটা অন্যায় কাজ করিয়েছি। আপনার ড্রাইভারকে পাঠিয়েছি মাইক ভাড়া করে আনতে। সকিনা যা বলার মাইকে বলবে। আশপাশের সবাই শুনবে।

তিনি এইবার বললেন, Oh God!

.

মাইক চলে এসেছে। মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে সকিনার মধ্যে পলিটিশিয়ান ভাব চলে এসেছে। সে ঘোমটা দিয়ে বসেছে এক রিকশার সিটে। মাইক হাতে নেওয়ায় কথাবার্তা খানিকটা শালীন হয়েছে। এখন এগুচ্ছে শ্রেণীসংগ্রামের দিকে। নমুনা

বড় লোকের বড় কথা। গরিবরে দেয় ব্যথা। গরিব কিন্তু ছাড়ব না। গরিব চেতলে কিন্তু খবর আছে। তখন টেকাপয়সা দিয়া পার পাবি না। তোর জিনিস টান দিয়া ছিঁড়ব। কি পাবলিক ভাই, ছিড়বেন না?

জনতার এক অংশ আনন্দের সঙ্গে বলল, ছিঁড়ব। ছিঁড়ব।

.

আহসান সাহেবের ঘরে দলিলের অনুসন্ধান সমাপ্ত হয়েছে। বলাই বাহুল্য, কিছু পাওয়া যায় নি। বড় মামা ঘনঘন নিঃশ্বাস ফেলছেন। তার চোখ লাল। তার কপাল ঘামছে। আহসান সাহেব বললেন, আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি। অসুস্থ। আপনার হার্টঅ্যাটাক হচ্ছে। আপনার উচিত কোনো কার্ডিয়াক সেন্টারে চলে যাওয়া।

বড় মামা বললেন, আমাকে উচিত অনুচিত শিখাবেন? আপনি উচিত অনুচিতের কী বোঝেন? আপনি যে আমার নাবালিকা ভাগ্নিকে রক্ষিতা বানিয়ে মজা লুটছেন, এটা কি মিথ্যা? আমি আপনার আগের ড্রাইভার কিসমতের কাছে খোঁজ নিয়েছি। সে বলেছে, প্রায়ই সে লিপিকে স্কুল থেকে নিয়ে সাভারে আপনার বাগানবাড়িতে যেত। এটা কি অস্বীকার করতে পারবেন? লিপি, তুই বল। ড্রাইভার কিসমত তোকে নিয়ে সাভারের বাগানবাড়িতে গেছে না?

আমি বললাম, হ্যাঁ গেছে। রাতে কখনো থাকি নি। দিনে দিনে চলে এসেছি।

আহসান সাহেব অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। বাবাকে দেখে মনে হচ্ছে তিনি যে-কোনো মুহূর্তে আমার ওপর ঝাঁপ দিয়ে পড়বেন।

আমি মিথ্যা অভিযোগ কেন স্বীকার করে নিলাম? আহসান সাহেবকে ফাঁদে ফেলার জন্যে। এখন আর আমাকে বিয়ে না করে তার উপায় নেই। দাবা খেলায় রাজাকে ঘোড়ার চাল চেক দিয়েছি। ঘোড়া আড়াই ঘর দূর থেকে চাল দেয়। তাকে কাছে আসতে হয় না। বড় মামা সকিনার সর্বনাশ করেছেন, তারপরেও তাকে বিয়ে করার জন্যে সকিনা কখনো বড় মামাকে বাধ্য করতে পারবে না। কারণ তার কাছে ঘোড়া নেই। আমার কাছে আছে।

বাবা আহসান সাহেবের দিকে তাকিয়ে কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, আহসান, এইসব কী শুনছি?

আহসান সাহেব আমার দিকে তাকালেন। আমি চোখের ভাষায় তাঁকে বললাম, Please marry me. বাংলাদেশের এক মেয়ে ক্রিকেট খেলার মাঠে এরকম কথা প্ল্যাকার্ডে লিখে উঁচিয়ে ধরেছিল। পাকিস্তানি এক ক্রিকেটারকে তার খুব মনে ধরেছিল। প্ল্যাকার্ডে সে লিখেছিল–Afridi, please marry me.

.

মামা বুধবারে বিদায় হলেন। আমি আহসানকে বিয়ে করলাম তার ঠিক দুদিন পর, শনিবারে। আমার বাবা-মা এই বিয়ে মেনে নেন নি। তারা আমাকে ত্যাগ করে চলে গেছেন। বাবার যাওয়ার কোনো জায়গা নেই। তিনি মনে হয় মুক্তিযুদ্ধে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করেছে এমন কোনো বন্ধুর বাসায় উঠেছেন। মুক্তিযোদ্ধারা আবার তলায় তলায় রসুনের বোঁটা। একজনের বিপদে আরেকজন ঝাঁপ দিয়ে পড়বে।

বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় বাবা চিৎকার করে বলেছেন জীবনে আমার মুখ দেখবেন না। এইসব বাবার কথার কথা। তিনি সাত দিন আমাকে না দেখে থাকতে পারবেন না। মা আর কিছু বেশি দিন পারবেন। দশ দিন বা এগার দিন। মেয়েরা পুরুষদের চেয়ে কঠিন হয়, এ কথা তো সবাই জানে।

আমার বিয়েতে মোস্তফা ভাইকে দাওয়াত দেওয়ার জন্যে হুমায়ূন স্যারের বাসায় গিয়েছিলাম। হুমায়ূন স্যার ও শাওন ভাবিকে দাওয়াত করার ইচ্ছা ছিল। তারা তো আসবেন না, এইজন্য দাওয়াত করি নি।

খুব সাহস করে হুমায়ূন স্যারকে আমি একটা প্রশ্ন করেছিলাম। ভেবেছিলাম তিনি বিরক্ত হবেন, জবাব দেবেন না। তিনি বিরক্ত হয়েছেন কি না জানি না, তবে আমার প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলেন। আমার প্রশ্ন ছিল, স্যার, ভালোবাসা আসলে কী?

তিনি বললেন, রবীন্দ্রনাথ যে প্রশ্নের উত্তর দিতে জানেন না, সেই প্রশ্ন আমাকে করেছ কেন?

আমি বললাম, রবীন্দ্রনাথ এই প্রশ্নের উত্তর জানেন না?

তিনি বললেন, না। রবীন্দ্রনাথ নিজেই জানতে চেয়েছেন, সখি ভালোবাসা কারে কয়? তারপরেও আমার ব্যাখ্যাটা বলছি। এটা সম্পূর্ণই আমার নিজের ব্যাখ্যা।

স্যার বলুন।

তিনি বললেন, ভালোবাসা এবং ঘৃণা আসলে একই জিনিস। একটি মুদ্রার এক পিঠে ভালোবাসা আরেক পিঠে লেখা ঘৃণা। প্রেমিক-প্রেমিকার মাঝে এই মুদ্রা মেঝেতে ঘুরতে থাকে। যাদের প্রেম যত গভীর তাদের মুদ্রার ঘূর্ণন তত বেশি। একসময় ঘূর্ণন থেমে যায়, মুদ্রা ধপ করে পড়ে যায়। তখন কারও কারও ক্ষেত্রে দেখা যায়–ভালোবাসা লেখা পিঠটা

বের হয়েছে, কারও কারও ক্ষেত্রে ঘৃণা বের হয়েছে। কাজেই এই মুদ্রাটি যেন সব সময় ঘুরতে থাকে, সেই ব্যবস্থা করতে হবে। ঘূর্ণন কখনো থামানো যাবে না। বুঝেছ?

আমি আর্মি অফিসারদের মতো স্যালুট দেওয়ার ভঙ্গি করে বললাম, ইয়েস স্যার। আমার মুদ্রা সব সময় ঘুরবে। কখনো থামবে না।

মজার কথা কী জানেন? দাওয়াত না করার পরেও হুমায়ূন স্যার এবং শাওন ম্যাডাম দুজনই এসেছিলেন। মনে হয় মোস্তফা ভাইয়ের কাছে শুনে এসেছেন।

আমাকে কে সাজিয়ে দিয়েছে বলুন তো?

শাওন ম্যাডাম।

সাজ শেষ হওয়ার পর আমাকে দেখে হুমায়ূন স্যার বললেন, এই মেয়ে তো ট্রয় নগরীর হেলেনের চেয়েও রূপবতী।

বাসর রাতে আহসান আমাকে কী বলল শুনতে চান? সে বলল, আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর।

.

পুনশ্চ

দৈনিক সমকাল পত্রিকায় বড় মামা এবং সকিনার কেচ্ছা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে ছাপা হয়েছে। সকিনা কাঁদছে এই ছবিসহ। খবরের শিরোনাম মামা ভয়ঙ্কর। পত্রিকায় খবর বের হওয়ার পরপরই পুলিশ মামাকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে গেছে। তার জামিন হয় নি। মনে হয় রিমান্ডে নেবে।